KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/২৮ সেবক সম্পূর্ণম, কলি-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : [illegible]
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 27/2 29-30	Year of Publication : ফাল্গুন সংখ্যা ১৩৮৯ (1980) Dec - March 1982
	Condition : Brittle / Good
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা কেন্দ্রিক সাহিত্যপত্র

অন্যদিন

সম্পাদক

শিশির ভট্টাচার্য

শরৎ সংখ্যা ● সংকলন আটাশ

১৩৮৭

With best Compliments from :

PIONEER ERECTORS

ENGINEERS & CONTRACTORS

Specialists in : Fabrication & Erection on Boilers
Pipelines, Structurals

28D, R. K. Samadhi Road
Calcutta-700 054

Phone : 35-7083 Gram : 'PIOERCTO'

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

*

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪।

*

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯।

দাম ঃ তিন টাকা

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৭
সংকলন ২৭

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রবন্ধ

প্রবুদ্ধ সেন
চিত্রা দেব

গল্প

সাধন চট্টোপাধ্যায়
শিশির ভট্টাচার্য
জীবন সরকার
শৈলেন চৌধুরী

বিশেষ আলোয়

কবিরুল ইসলাম

কবিতা

অখিল দত্ত * অজিত দেব * অমল দেব * অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় * অশোক চট্টোপাধ্যায় * আনওয়ার আহমদ * ওয়াজেদ আলি * কবিরুল ইসলাম * কাজী আমিনউদ্দিন আহমদ * কিরণশঙ্কর মৈত্র * কৃষ্ণা বসু * গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় * চিত্রভানু সরকার * তাপস গুপ্ত * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দীপক ভদ্র * দীপক সরকার * দুর্গা চট্টোপাধ্যায় * নমিতা ভট্টাচার্য (বসু) * নির্মল বসাক * নীতীশ বসু * নীরদ রায় * প্রবীন সরকার * প্রভাত মিশ্র * প্রত্যুষ-প্রসূন ঘোষ * বাণী বসু * বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় * বীরেন সাহা *

ব্রজ চট্টোপাধ্যায় * মমতা রায় * মাণিক চক্রবর্তী * রথীন কর * শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় * শামসুল ইসলাম * সমর চক্রবর্তী * স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় * সুমিত ভাদুড়ী * সুশীল পাঁজা * সুশীল রায় * সৈয়দ কওসর জামাল।

বিদেশী কবিতা

আমেরিকা

আড্রিয়ান হেনরী
অনুবাদঃ অর্ণব সেন

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

সংস্কৃত

কবি অমরু
অনুবাদঃ তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

জগন্ময় মজুমদার
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত

কবি পরিচিতি

কানপুর

মধ্যরাতে

সাধন চট্টোপাধ্যায়

নীলুর জীবনে শেষ চা খাওয়া ছিল ওটা।

তখন ঠিক সাতটা উনপঞ্চাশ। সন্ধ্যারাতই বলা যেতে পারে। জুন জুলাই মাসে দিন বড়, রাত ছোট। মিষ্টির দোকানে আলো জ্বলছে, ডাক্তার-খানায় রোগীদের ভীড়, গমকলের জাঁতা শব্দ করে ঘুরছে, মুদী দোকান, খড়কাটা কল এবং তেলেভাজার দোকানে খরিদ্দারের আনাগোনা। এ ছাড়া ব্যস্ত বি, টি রোডের দুপাশে কার্বাইডের আলো জ্বালিয়ে বেশ কিছু লোক সওদাসামগ্রী নিয়ে মিলমজুরদের আশায় বসে আছে। নিমের দাঁতন, কৈনি, সস্তা ছিটের জামাকাপড়, লটারির টিকিট—নানান আকর্ষণ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বড় পেট্রল পাম্পটার এ পাশে, সি, এম, ডি, এ খুঁড়ে রেখেছে যে মস্ত ড্রেনটা, তারই একধারে পুরোনো হার্ডওয়ারের দোকানটা ঘেঁষে ছোট্ট চায়ের দোকানের উনুনে হিস হিস করে জল ফুটছিল। ভেতরটা অপ্রশস্ত; খান দুয়েক বাঁশ-বাখারির লম্বা বেঞ্চ, চায়ের দাগের অপরিচ্ছন্ন নড়বড়ে টেবিল, খাপড়ার চালের আড়া থেকে ঝুলছে একটা পেট্রোম্যাক্সের বাতি। এলাকার বহু পুরোনো দোকান, বেশ নামকরা। ভাঁড়ের চায়ে এমন বিশিষ্ট গন্ধ থাকে, এই অনাড়ম্বর পরিবেশে সুযোগ পেলেই মানুষ অনেক লেবেল আঁটা দোকান ছেড়ে এখানে এসে ভীড় করে।

নীলু চা খাচ্ছিল। ভিতরে বসে নয়; যেখানে ছাঁকা চা-পাতা ডাঁই করা আছে, তারই একধারে নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন রেখে গরম ভাঁড়ে ঠোঁট দুটো এগিয়ে নিয়ে মৃদু মৃদু চুমুক দিচ্ছিল।

এ অঞ্চলে এলে, এখানে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া তার অভ্যেস। এলাকাটাও বেশি দূরে নয়, তার ইতস্তত ঘুরে বেড়াবার পরিধির মধ্যেই। থাকে সে শিল্পাঞ্চলে, কাজও করে স্থানীয় এক স্কুলে। অখণ্ড অবসর থাকায় প্রায়ই

বিকেলের দিকে একা একা বাইরে বেরিয়ে পড়ে। খুব দূরে নয়; কখনো ব্যস্ত বি. টি. রোড, শিল্পাঞ্চলের অলি-গলি, বাজার স্টেশন কিংবা গুমোট আবহাওয়ায় একা একা গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। মানুষটা সে নিঃসঙ্গ। কোলাহল থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতে চায়। তবে এই একাকীত্ব কোন ব্যাধি নয় তার, স্বভাবটাই গড়ে উঠেছে এই ধাঁচে। সব কিছুতেই কৌতূহল আছে কিন্তু জড়াতে চায় না কোথাও। তাস-পাশা, সিনেমা রাজনীতির খবর রাখে সে, দেখা হলে পরিচিতদের সঙ্গে হেসে কথাও বলে, অন্যায় মুখ বুজে মেনে নেয় না কিন্তু নিজেকে মেলে ধরতে পারে না। ফলে, নীলুর এই উদ্দেশ্যহীন কৌতূহল অনেকেরই সন্দেহের বিষয়।

মজা পুকুরে যেমন বুদ্‌বুদ্‌ বেশি ওঠে, বদ্ধ সমাজের মানুষও একটু বেশি সন্দিগ্ধচিত্তের—বৈচিত্র্য দেখবার বা বুঝবার মনই তৈরী হয়নি। যেমন পরপর কয়েকদিন কাগজ কলের পাশে বেশ্যা গলিটার মুখে, তাকে তার সহজাত দৃষ্টিতে পান চিবোতে দেখে, কিছু লোক ফিস ফিস করল, 'ছিঃ ছিঃ মাষ্টার মানুষ!···চরিত্তিরের দোষ আছে নাকি!···কোন ভদ্দর লোক অমন-ভাবে তাকায়?' প্রকাশ্য রাস্তায়, হাতে গুঁজে দেয়া কারও লিফলেট পড়তে দেখে অনেকেই চোখ পাকালো 'শালা নক্‌শাল!' কোন কোন সময় চায়ের কাপে রাজনীতির তুফান তোলা যুবকেরা হঠাৎ চুপ করে যায়—'স্পাই!' কিন্তু, নীলু অর্থাৎ নীলরতন গুহরায় অত্যন্ত নিরীহ, নির্বিরোধ, গণতন্ত্র-প্রিয় এক নাগরিক যিনি ট্যাক্স দেন, যার ভোটার লিস্টে নাম আছে এবং যিনি আইন-কানুনকে শ্রদ্ধা করেন এবং রাস্তা-ঘাটের মানসিক অসুস্থতা যাকে গভীর ভাবে চিন্তিত করে তোলে।

পাতলা ভাঁড়টা অত্যন্ত গরম, হাত বদল করতে হচ্ছিল নীলুকে। বাথারি বেঞ্চে কিছু মজুর শ্রেণীর লোক চায়ের আশায় তাকিয়ে আছে, একজনের চোখের সামনে পড়ে আছে সকালের বাসি কাগজ 'সন্মার্গ'। দোকানদারটি আপন কাজে মগ্ন। আদুল গা ঘামছে; পাকা চুল ও মোটা গোঁফের আড়ালে গম্ভীর মুখে যন্ত্রের মত দু হাতের মগে উপুড়-ঢালায় তৈরী করছিল চায়ের সেতু। তদারকি এবং খরিদ্দারের পয়সা আদায় করছিল এক ছোকরা।

নীলুর কপালে বিনবিনে ঘাম। পেট্রোম্যাক্সের আলোতে উজ্জ্বল তার শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিত চুল, ঈষৎ লম্বা নাক, আয়ত চোখ এবং ক'দিনে আচ্ছা দাড়িতে ছুঁচলো থুতনিটা। পাঞ্জাবীর গলার কোণা দুটো এলিয়ে থাকায়

কণ্ঠার নীচে রোদে পোড়া বুকের ত্রিভুজটুকু বেয়ে সুড়সুড় করে ঘাম গড়াচ্ছিল।

সে অবাক চোখে দেখছিল দোকানের ভিতরে সেই ব্যক্তিটিকে। কান ঢাকা চুল, চোয়াড়ে নৃশংস মুখটার অধিকাংশ গোঁফ জুলফিতে অধিকার করে আছে, চোখ জোড়ায় ব্যস্ততা ও সন্দেহের দৃষ্টি। ময়লা ট্রাউজার আর লাল ছোপের একটা জামা গায়ে। পকেটের বিড়িটার মশলা খসিয়ে চটপট গাঁজার গুঁড়ো ভরছিল। মনে হল জরুরী কোন কাজ ফেলে দোকানে ছুটে এসেছে। এই মুহূর্তেই উঠে যেতে হবে তাকে।

কর্কশ গলায় ছেলেটাকে তাড়া দিয়ে বলল, 'জলদি! হাঁ করে দেখছিস কি শালা?' দোকানদারটি বিরক্তিতে ঘাড় বাঁকাল কিন্তু হজম করতে হল তাকে সব। বোঝা গেল, ব্যক্তিটিকে কিছু বলা যাবে না। নীলু মজা দেখছিল আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কনুইয়ের ধাক্কায় ভাঁড়টা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। চা-টুকু শেষ করা গেল না।

বিশ থেকে বাইশ বছরের তিন তিনটে যুবক নিঃশব্দে অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে এতগুলো লোকের সামনে মানুষটার উপর চড়াও হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা দিশেহারা হয়ে টেবিলের কোণায় পা দিয়ে রাস্তায় টপকে পড়তে গিয়ে পিছলে পড়ল। টেবলটা নিয়ে উল্টে যেতেই একজনের স্টীলের চাকুটা নীলুর নজরে পড়ল। তড়িৎ বেগে চোয়ালের গুলি দুটো শক্ত করে সে ঝুঁকে বজ্রকঠিন কব্জিটা ওর তলপেটে ঠেলে দিয়ে হিসিয়ে উঠল 'শাল্লা! শু-য়া-র কি বাচ্চা!'

বহু দিনের আক্ষেপ পূরণ হোল আজ। নীচের লোকটা ভয় ও যন্ত্রণায় গলা কাঁপাল, 'জহর! খবর্দার! জহর, জহর!'

'তোর বাপ!'

চোখের পলকে লোকটাকে তুলে নিয়ে তিনজন পাশের অন্ধকারে চলে গেল। নীলু দেখল পেট্রোম্যাক্সটা ধস্তাধস্তিতে দ্রুত দুলছে, টেবিলটা ওলটান, মশলা খসা বিড়িটা মাটিতে পড়ে আছে আর একস্থানে টাটকা কিছু রক্ত।

সন্ধ্যারাতে, চলমান জনজীবনের কোলাহলে এমন এক হিংস্র পরিকল্পনা যে লুকিয়ে থাকতে পারে, নীলুর চিন্তায় ছিল না। দেখল দোকানের চা-প্রত্যাশী খদ্দেররা হাওয়া, একটা ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত অঞ্চলটাই

ফাঁকা। কোন চিৎকার হৈ-হুল্লোড়ের আগেই ত্রস্ত ইঁদুরের মত দোকান-পাটের ঝাঁপ টেনে দিয়ে মানুষজন মিলিয়ে যাচ্ছে। কেবল পাশের অন্ধকারে তখনও শোনা যাচ্ছে চাপা, ক্রূর কিছু শব্দ এবং হুমহাম মাটিতে খুঁটি পোতার মত কি যেন থ্যাতলানোর আওয়াজ। লোকটার মাড়ি, দাঁত, খুলি কিমা করে দেয়া হচ্ছে।

'কেউ ছুটে আসছে না? কোথায়, লোকজন কোথায়?'—নীলুর গলা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে এল কথাগুলো। কেউ জবাব দিল না, চারদিক কেবল থমথম করছে। কেবল দোকানদার খুচরো পয়সাগুলো হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'আভি চলে যান। দের করবেন না বাবু।' শরীরে কাঁটা দিতেই সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। মনে হল দোকানের আলোতে একজনের সঙ্গে তার চোখাচুখি হয়েছিল, স্টীলের চাকুটা ছিল যার হাতে। সারা মুখে ঘাম, চোখের তারা দুটো অভিব্যক্তিহীন, ফটফটে সাদা—হাসপাতালের পাথরের সিঁড়ির মত। মুখটা তার পরিচিত, খুবই পরিচিত।

আলাপ পরিচয় নেই কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই স্টেশনের আশেপাশে সে ওকে দেখে। কতদিন ঠোঁটের সিগারেট থেকে নিজেরটা ধরিয়েছে! খেলার আলোচনা করেছে। যখনই মাথায় খেলে গেল সে সাক্ষী হয়ে গেছে, অনুসরণকারী পায়ের শব্দের ইঙ্গিত পেয়েই সে ছুটতে শুরু করল। উল্টোমুখী একটা বাস স্পিড কমাতেই, সে দিশেহারা হয়ে হাতল ধরে লাফিয়ে উঠল—ডান পায়ের চটিটা ছিটকে গেল অন্ধকারে। বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল এ বাসটায় না উঠতে পারলে তার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র দু মিনিট কারণ সে এক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী।

বাসের মধ্যে ভয়ানক হাল্কা লাগছে বুকটা। বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দ অপার্থিব—যদি মৃত্যুর প্রশ্ন থাকে তো কথাই নেই। তিন স্টপ পর একজন নেমে যেতেই নীলু বসল। বাইরের হাওয়ায় ঘাম শুকোতে শুরু করেছে। ঠিক করল পরের স্টেশনে নেমে ঘুরে বাড়ি ফিরবে। রাত বিশেষ হয়নি, অসুবিধে হবে না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতেই হাড় হিম হয়ে গেল। সে সাক্ষী হয়ে গেছে, আততায়ী চিনে ফেলেছে তাকে। একবার ভাবল পথেই থানা পড়ে, নেমে প্রাণ-সংশয়ের কথা পুলিশকে জানিয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। হয়ত নীলুকে লোকটা চিনতে পারেনি, নিজেদের কাজেই ওরা ব্যস্ত ছিল। থানার স্টপে না নেমে পরের স্টেশন দিয়ে ঘুরে বাড়ি

পৌঁছে গেল। কিন্তু আতঙ্কের গুরুভার কাউকে বলতে পারল না, তার বউকেও নয়।

রাতে ঘুম হল না। চোখের উপর দিয়েই ঘণ্টাগুলো নেচে নেচে গেল। পরদিন বাজার থেকে ফিরে, কাগজটা পড়ে, দাঁড়ি কামিয়ে একটু সকাল সকাল খাওয়া সেরে স্কুলে রওনা হয়ে গেল। লেভেল-ক্রশিংএর ওপাশে স্কুল। এপাশে নির্দিষ্ট একটি দোকানে প্রতিদিন সে সিগারেট কেনে, একটি পান চিবোতে চিবোতে চুনের বোঁটা হাতে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে লাইন পার হয়ে সে স্কুল ঢোকে। আজ লোকটাকে পান সাজতে বলে, আয়নায় নিজের মুখটা দেখে পাশে তাকাতেই মনে হল অপরিচিত একজন নীলুকে ফলো করছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার চেহারাটা জরিপ করছে যেন। বিষয়টা তার ভাল লাগলো না। সরে এসে ঝোলা দড়িটায় সিগারেট ধরিয়ে, দূরে তাকাতেই নীলু খানিক চমকে উঠল। লেভেল-ক্রশিংএর উপর জহুর দাঁড়িয়ে আছে। বুকের বোতাম খোলা, শুঁকে শুঁকে দেখবার মত চারদিকে তাকাচ্ছে আর আঙুল দুটো ঠোঁটে চেপে চেপে সিগারেটের গোড়াটা টানছে। মনে হয় কার জন্য অপেক্ষা করছে সে। দোকানদারের হাত থেকে পানটা নিয়ে মুখে গুঁজে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল জরিপ করা লোকটা নেই, আস্তে আস্তে জহুরের সঙ্গে ফিসফিস করছে, তাকাচ্ছে দোকানটার দিকে। নীলুর বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে পয়সা মিটিয়ে একটা হুড তোলা রিক্সায় সোজা বাড়ি চলে এল। লেভেল-ক্রশিং আর পার হল না।

সুধা তখন কড়ায়ে হাতা দিয়ে কচুর শাক ডলছিল। ছুটে এসে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ আবার কি ঢং!' নীলু ম্লান হাসিতে, কাচুমাচু হয়ে বলল, 'পেটটায় পাক দিচ্ছে!' দুমদুম করে সুধা রান্নাঘরে ফিরে গেল।

সারাটা দিন নীলু চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইল। দু হাতের তালুতে মাথাটা রেখে, পা দুটো সটান ছড়িয়ে চেষ্টা করল ঘুমোবার। চোখ দুটো যেন শক্ত হয়ে গেছে! ঘুম আসছে না। এক অসহ্য যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সামান্য শব্দটিও যেন বিরাটভাবে বাধার সৃষ্টি করে চলেছে। সে সুধার ঘর মোছা, বাসন মাজা, স্নান, চুল ঝাড়া আঁচড়ান এমনকি থালা বাসন নামিয়ে খাওয়ার শব্দও শুনতে লাগলো। পাঁচ বছরের শিশু কন্যাটি পেটের উপর কচি হাত দুটো রাখতে সে বিরক্ত বোধ করল। চেষ্টা করল হেসে আদর করতে, মনে শান্তি পেল না।

সন্ধ্যায় সুধা শাড়ি পরে, মাথায় চিরুনি চালিয়ে চলল স্টেশনে। এভাবে দুমদাম বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনদিন সে নীলুর মতামত নেয় না। নীলু মনে করে না কিছু, বউকে সে ভয় পায়। বড্ড মুখরা। আজও মুখ ঝামটে বলল, 'বেরোচ্ছি। ওরা রইল।.....দিন রাত শুধু চিৎ হয়ে থাকা!'

'বেরোচ্ছ?'—নীলু কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তা, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব? পিত্তি জ্বলে যায় কথা শুনলে।'

নীলু মুখ ব্যাজার করে বসে রইল। ভাবল, বউয়ের এ ভারী অন্যায়। অসুস্থ শরীরে মানুষটা ফিরে এসেছে, দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসার কোন নাম নেই। পৃথিবীতে সবাই বিত্তবান হয় না, নীলু সামান্য আয় করে বলে সুধার এই অবজ্ঞা! সামান্য সুখের জন্য মানুষ যে কত নির্মম হতে পারে! সে আপন মনে হাসতে লাগল। সুধা বলল, 'পাগল!'

সে রাতেও অনিদ্রায় আক্রান্ত হওয়ায়, পরদিন নীলুর চেহারাটা চোখে লাগবার মত পাল্টে গেল। ঠোঁট দুটো শুকনো, চোখের কোলে গভীর কাল, চোয়ালের হাড়টা ঠেলে উঠেছে। তবুও, সামান্য কথাতেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাসে! মনটা হাল্কা করে নিতে চায়। নীলু শোনে পাশের বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে সুধা খুনের আলোচনা করছে। গতকাল স্টেশনে গিয়ে সে শুনে এসেছে দোকানদারের মুখে। কয়েকটা পুলিশ গাড়িও দেখেছে এবং সমগ্র এলাকাটায় নাকি উত্তেজনা ছিল। নীলু চুপচাপ চোখবুজে বিছানায় শুয়ে থাকে। সুধা এসে বলল, 'আজও স্কুলে যাবে না? কি হয়েছে? ডাক্তার দেখিয়ে অর্থদণ্ড দিয়ে আসতে বারণ করছে কে?'

—'অনেক ত স্কুল হল, কি বল? এখন একটু গার্হস্থ্য জীবন...'

—'ন্যাকামো—'

সুধা বলে যেতেই নীলুর ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেল, আবার সেই চিন্তাটা এসে তার মুখ বন্ধ করে সটান শুইয়ে দিল। একটা শ্বাসরুদ্ধকর ভয়! রোগের মধ্যে সে অনুভব করে প্রায়ই দম বন্ধ হয়ে যায়, আর ঘুম আসে না। নিজেকে ইনসিকিওর লাগে, বড় অসহায়।

সুধা মুখে যতই প্রতাপ প্রকাশ করুক না কেন, দিন তিনেক পর নীলুর দেহটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে বিকেলে চা দিতে গেলেই, লোকটা কাপটা হাতে নিয়ে খানিক চোখ পাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে

ঠক্ করে রেখে দেয়। চুমুক দিতে পারে না। তখন মনে হয় সুধাকে সে চড় দিয়ে দেবে। সুধাও অবাক দৃষ্টিতে তাকাতে নীলু গভীর নিশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে বলে, 'কোন স্বাদ পাই না।'

'এক কাপ দুধ দেবো?'

'না।'

'যা খুশি কর। আমার আর ভাল লাগে না।'

বিকেলে স্কুলের তিন বন্ধু এসে হাজির। খবর নিতে এসেছে। প্রিয়নাথ বলল, 'কিরে! বলা-কওয়া নেই ডুব? আমরা তোমার ক্লাশ করে মরছি।'

'আয়, বস বস।'—নীলু বিছানায় সরে গিয়ে ওদের বসার জায়গা করে দেয়। 'ওদেরকে দেখে খুব ভাল লাগে তার। কল্যাণব্রত ওর চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি চেহারা বানিয়েছিস? আমরাতো ভাবলাম শ্বশুর বাড়িতে মজা লুটছিস।'

'হ্যাঁ! বার বছর হয়ে গেল, এখনও চারদিন পড়ে থাকব?'—নীলু হাসতে থাকে। বিজন বসেছিল চুপচাপ। নীলুর দৃষ্টি তার ভাল লাগছিল না। সমস্ত চোখ মুখে অস্বাভাবিকতা।

'কি হয়েছে? ডাক্তার দেখাস না?'

'হবে আবার কি?'—শুকনো ঠোঁট জোড়া মেলে নীলু অসহায় ভাবে হাসল।

'এমন সুন্দর বিকেলে শুয়ে আছিস? এ ত ভাল ঠেকছে না!'—প্রিয়নাথ রহস্য করে বলে। 'শুয়ে থাকব কেন, প্রকৃতি দেখছি। দেখ, জানলার কাছটায় কেমন রঙ্গন ফুটেছে!' বিজন চারমিনার ধরিয়ে প্যাকেটটা তিনজনের সামনে রাখল। মুখটা তুলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'রোমান্স? বলি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ? বয়েসটাও চারের কোঠায়, দ্বিতীয় যৌবনের পালা!'

নীলু শুকনো হাসি দিয়েই অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সুধা তিন কাপ চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তখন।

'নীলু খাবে না?' প্রিয়নাথ জিজ্ঞেস করে।

সুধার জবাবের আগেই নীলু ভয় পেয়ে বলল, 'না, না, আমি খাই না।.... আমার ভাল লাগে না।'

অন্যান্য দিনের মত আপ্যায়নে উচ্ছলতা নেই। আঁচলে মুখের ঘামটা মুছে,

সুধা ফিরে আসতেই প্রিয়নাথ বলল, 'গৃহবিবাদের মাঝপথে আমাদের প্রবেশ ঘটল নাতো ?'

সুধা ঘরে দাঁড়ায়।

'তা করলেও বুঝতাম কিছু বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে।···তিনদিন ধরে ভূত সেজে আছে, ঘর থেকে নড়ছে না। মানুষ সহ্য করতে পারে ?'

প্রিয়নাথ সিরিয়াস হয়। সশব্দে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'হ্যাঁরে, কদিন ছুটিতে থাকবি ? অসুখ হলে ডাক্তার দেখা ?'

'আমার কিছু হয়নি।'

সুধা মুখ ভেঙ্গিয়ে উঠল, 'কিচ্ছু হয়নি !···পেটে পাক খাচ্ছে বলে সেই যে এসেছে, নড়া-চড়া নেই। বললাম, যা অর্থদণ্ড লাগে লাগুক।···মনের রোগ হলেও তো তার চিকিৎসা আছে।'

ঘরের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে কার চিৎকারে ওরা তিনজন এবং সুধা চমকে ওঠে। নীলুর চোখ দুটো জ্বলছে, ভয়ানক কাঁপছে সে।

'আমি পাগল ? পাগল পেয়েছ আমায় ?''

তিন বন্ধুর অবাক দৃষ্টি ওর মুখের দিকে। সুধাও পলকহীন। নীলু বিছানায় ঘুষি দিয়ে বলল, 'ডাক্তার ? কেন, কিসের জন্য ?'

'নীলু।' প্রিয়ব্রতর গলা ঋজু হতেই ঝপ করে নীরবতা নেমে এল। কেউ কোন কথা বলছে না। কিছু নিশ্বাস পতনের শব্দ শোনা গেল।

আরও মিনিট পনের ওরা বসে রইল। প্রত্যেকেই ভাবছে জটিল কিছু ঘটে গেছে নীলুর। সুধাকে পাশের ঘরে নিয়ে কি ফিসফিস করল, তারপর নীলুকে ঘুমোবার উপদেশ দিয়ে তিনজন নিঃশব্দ, ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল, যেন কবরে ফুল দিতে এসেছিল তারা।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে কোন কথা হল না। নীলু পুরোন তুলা-ওঠা তোষকটায় বসে আছে। শিশু মেয়েটার পেচ্ছাবের ছোপ ছোপ দাগ এবং গন্ধও আসছিল মাঝে মাঝে। মনে মনে ভাবছে সে আজ-কাল-পরশু যে কোনদিন আততায়ীর আঘাতে প্রাণ হারাতে পারে। কিন্তু ঘটনাটা কাকে বলবে সে ? থানা-পুলিশে তার কোন বিশ্বাস নেই, পাড়া প্রতিবেশীরাও আজকাল যে-যার আত্মচিন্তায় এত ব্যস্ত, হাঁ হুঁ উপদেশ ছাড়া অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে চায় না। তাহলে ? রাস্তায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকলে ভয়ে কেউ এগোবেই না। কল্পনায় সে মৃত্যু যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে

লাগল। রান্নাঘরে সুধা তখন বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে। দেওয়ালে ছোট ছোট ছায়া দুলছে। নীলু তাকিয়ে দেখে আর ভাবে ওর অবর্তমানে, এ অসহায়-গুলোর কি হবে। বুকটায় যন্ত্রণা দেখা দেয়। বধ্যভূমিতে পরিচিত কাউকে না দেখতে পেয়ে, চোখের জলে বিদায় নেওয়ার মত, রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে সে।

সুধার আর উগ্রমূর্তি থাকে না। সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। রাতে মোলায়েম স্বরে বলল, 'তুমি ডাক্তার দেখাও।'

'আমার কিছু হয়নি গো—

'বেশ তো, তা হলে ডাক্তার দেখাতে ভয় কি ?

'খামাকা, টাকা খরচ—

'সে তোমায় ভাবতে হবে না।'

নীলু বাধ্য ছেলের মত চুপ করে থাকে।

পরদিন সকালেও, সুধা এক বাটি দুধ হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তারের কথা বলল। নীলু ম্লান হাসল শুধু। শরীরটা তার এত দুর্বল, রেগে উঠতে পারছে না।

আজও সারাদিন শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু কেবলই তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে। কত শব্দ যে পৃথিবীতে আছে! কেবল ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় তার।

সন্ধ্যার পর। গোল চাঁদ উঠে বেশ জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে যখন, আকাশে চলছে মেঘের সঙ্গে লুকো-চুরির প্রবাহ, উঠোনের জঙ্গলে মনের আনন্দে ঝিঁঝিরা ঐকতান তুলেছে, নীলুর ভয়ানক পেচ্ছাব পেল। বিছানা থেকে নেমে দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে, সে বসল নারকোল গাছটার গোড়ায়। হঠাৎ মনে হয় পা থেকে শিকড় নেমে মাটিতে গেঁথে যাচ্ছে, কোন দিন আর সে উঠতে পারবে না, এখানেই মরে পড়ে থাকবে। সুধাকে ডাকবে কিনা ভাবার আগেই, জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরতে দেখল, বিছানার সামনে ডাক্তার বসে আছে। এলাকার, পরিচিত ডাক্তার। বহু রুগী মেরে, সারিয়ে, ভুগিয়ে সে গাড়ি বাড়ি তৈরী করে ফেলেছে। মাথার চুলে টাক, মুখে বলিরেখা, দৃষ্টি অনুভূতিহীন। যন্ত্রের মত স্টেথোস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক, পিঠ পরীক্ষা করে, নাড়ী টিপে একটা ইনজেকশন ঠুকে, শ্লেষ্মা ও পিত্তের আধিক্য দেখে অষুধের একটা লম্বা

ফিরিস্তি লিখে দিল। সুধা টাকার বাক্স খুলে প্রণামী দেবে, বলে ডাক্তার ঘাড় বাঁকিয়েছিল সেদিকে। নীলু অপলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে জামার কলারের উপর দিয়ে একটা মস্ত ছারপোকা হেঁটে যাচ্ছে। নীলু কিছু বলার আগেই জামার মধ্যে ঢুকে গেল।

নীলু আর উত্তেজিত হয় না। ডাক্তারের ফরমাইস মত এক গাদা অষুধ খেয়ে ঝিমোয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। জেগে থাকলে কি যে চিন্তা করে সুধা তার কোন হদিশই পায় না। লোকটা শুধু তাকিয়ে দেখে দেয়ালের খসা পলস্তারা, চিলু চিলু কাট, রং চটা জানলা কপাটের জং ধরা কব্জা। মাঝে মাঝে ভারি নিশ্বাস পড়ে আর ঠোঁট, চোখের কোণা, কানের লতি দিনে দিনে ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে। সুধাকে মাঝে মাঝে হেসে বলে, 'মিছেই অষুধ গিলোচ্ছ! কিছুই হয়নি আমার।'

সুধা ম্লান হাসে। নীলু অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে, 'কাওয়ার্ড। কাওয়ার্ড! ...চেঁচিয়ে বলতে তো হয় কথাগুলো?'

'কিসের কথা? ঘুমোতে বলছি না?' সুধা ভয়ে ভয়ে নীলুকে সান্ত্বনা দেয়। নীলু ফস্ করে একটা সিগারেট ধরায়, উল্টেপাল্টে নিজের হাতটা দেখতে থাকে।

এ কদিনের উত্তেজনায় সারা বাড়িটা অগোছালো হয়ে আছে। মনেই হয় না এখানে কোন গেরস্থ বাস করে। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। উঠোনে এক হাঁটু জঙ্গল, ঘরে সময় মত ঝাঁট পড়ছে না; স্তূপাকৃতি ভেজা জামাকাপড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বিছানার ছেঁড়া তুলো মাটিতে গড়াচ্ছে। সুধার মনে ডাক দিলেও, তার কিছু করার নেই। সন্ধ্যায় বাচ্চাদের খাইয়ে, নীলুকে অষুধগুলো এগিয়ে, আঁচল পেতে গা এলিয়ে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না। ধড়মড় করে উঠল যখন, অনেক রাত। দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মুখটা তুলে দেখে নীলু উত্তেজিত।

'আমি জানি...পাখি উড়ে গেল চোখেই পড়ল না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'—সুধা ছুটে আসতে নীলু দ্রুত দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোঁট জোড়া বিড়বিড় করে বলছে, 'শোনান দরকার... কৌটোর মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে।'

'ঘরে চল—'

'বুঝলে না, আমার বলা দরকার।...মানুষকে বলা দরকার।'

সুধা কিছু বুঝবার আগেই নীলু উঠোনের জঙ্গল ভেঙ্গে দৌড় দিল। সুধা ছুটে ওকে জড়িয়ে ধরতেই, নীলু হাসে, ছাড়ছ না কেন।...আমি কথা বলব।'

'পায়ে ধরি এস।...শরীর খারাপ হলে, আমি আর সামলাতে পারব না।'

'বাইরে বার হব না?...কথা শোনাব না?'

'এ মাঝরাতে কে তোমার কথা শুনবে? সব ত ঘুমুচ্ছে।...ভোর হোক তারপর।' নীলু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল এখন রাত। একটা পাখীর ডানা ঝাপটাবার শব্দ শোনা গেল। কয়েকটা ইঁদুর ছুটল ইতস্ততঃ; নীলুর মনে হল সেদিনের সন্ধ্যায় মানুষজন ঝাঁপবন্ধ করে পালাচ্ছে। ভয় করতে লাগল তার। মুখ দিয়ে শব্দ করল হুঁঃ। তারপর সুধার হাত ধরে আস্তে আস্তে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

মহানাগরিক

শিশির ভট্টাচার্য

পর পর অনেকগুলো বাস ছেড়ে দিল বংশীলাল। কিন্তু তাও —নাঃ। উপচে-পড়া ভীড় একটুও কমবার লক্ষণ দেখা গেল না। পাঁচটা একত্রিশের নৈহাটি লোকালটা পাবার কোন চান্সই দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই ভ্যাপসা গরমে কুন্তিত লড়তে তার মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না। জামা কাপড়ের মায়াটাও কিছু কম নয়। পাঁচটা তিন। অগত্যা—। অনেক হিসেব করে, হাঁটার স্পীড ও রাস্তার সচল ভিড়ের ধাক্কার রেশিও কষে, মিনিট গুণে এইটুকু পথ বংশী হাঁটাই স্থির করল। মল্লিকবাজার থেকে শেয়ালদা। এই তো ব্যাপার। কিন্তু কি আশ্চর্য পার্কসার্কাস ডিপোর মুখে যাবার ফিরতি ট্রামগুলোও বাদুড়ঝোলা। মরুকগে ছাই। বংশী হাঁটা দিল। অবিনাশ অন্তত মিনিট পাঁচেক আগে সাত নম্বর প্লাটফর্মের গেটের সামনে বংশীকে না দেখতে পেলে ওর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে শুরু করে দেবে। নাঃ, শালা, এই ডেইলি প্যাসেঞ্জারীর দৈনিক রুটিন আর সহ্য হয় না।

হাঁটার স্পীড আরও একটু বাড়ায় বংশী। কিন্তু হাঁটারও কি জো আছে! ঠিকভাবে সোজাসুজি তিনগজ পথ চলে কার বাপের সাধ্যি। হয় সি-এম-ডি-এ, নয় ভিখিরি, নয়তো জাতীয় পবিত্র লায়াবিলিটির অবতার হকার অধিকৃত রাজ্যসীমা। বংশীর মনে পড়ে যায় কবে যেন তলস্তয়-এর একটা গল্প পড়েছিল—মানুষের কতটুকু জমি দরকার? সেই আজব দেশটা বংশী এতদিনে যেন খুঁজে পেল। অঢেল জায়গা পড়ে আছে। রাতারাতি যতটা খুশী চাটাই বেঁধে দখল করে নিলেই হল। বাঙালীর আবার কত গর্ব সৌন্দর্যপ্রিয় জাত বলে। বংশীর মনে হল এত বড় সৌন্দর্যছুটু রঙছুটু জাত আর ভূ-ভারতে নেই। ছ্যাঃ।

হঠাৎ চোখ পড়ে বংশীর সামনের খুস্টান কবরখানার গেটের বাঁ হাতি ফুটপাতের ওপর একটা সুন্দর করে ঘেরা জায়গা এবং সামনে একটি প্রস্তর

বেদী। ফলকে লেখা কবিতার পংক্তিটি বহু পরিচিত—"দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল……

হায় মহাকবি কার এ দুর্মতি এখানে এইভাবে তোমাকে অপমানিত করবার। এই পথে পথিকেরা কেবল দাঁড়াচ্ছেই না। আশেপাশে তারা যথেচ্ছ দেহজলের প্রস্রবণও সৃষ্টি করে চলেছে। আরও একটু এগুতেই বংশীর নজরে পড়ল কবরখানার পাঁচিলের গা ঘেঁষে ফুটপাতের ওপর—যদি তাকে ফুটপাত বলা যায় অবশ্য—সার-সার চাটাই, ছেঁড়া কাপড়, চট কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু জিনিসে কোনমতে খাড়া করা পঞ্চাশ ষাটটি দরিদ্র পরিবারের জীর্ণ আস্তানা। এরা কারা? এতদিন কোথায় ছিল? সবাই তো উদ্বাস্তু কিংবা বাঙালী বলেও মনে হচ্ছে না। যুবক বৃদ্ধ শিশু তরুণী সবাই আছে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপর অসংখ্য চুলাও জ্বলছে অর্থাৎ রান্নার আয়োজন চলেছে।

—"এই বংশে…"

হঠাৎ পিঠের ওপর প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় খেয়ে চমকে উঠল বংশী।

—ওঃ তুই। তোর না স্টেশানে দাঁড়াবার কথা।

—মাইরি তুই যা দৌড়ুচ্ছিস না। তোকে পায়ে হেঁটে ধরে কার সাধ্যি।

—দৌড়োব না। এই ভিড়ে কোন গাড়ীতে ওঠবার যো আছে। সময় মতো না পৌঁছুতে পারলে তুই তো আবার আমার শ্রাদ্ধ করে ছাড়বি। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে হাঁটার স্পীড কমিয়ে দেয় বংশী।

—আরে এইখানে ব্যাঙ্কুভিলায় আই-টি-ও অপিসে একটা কাজ পড়েছিল। একটু আগে বেরিয়ে তোকে পার্ক স্ট্রীটে তোর অফিসে গিয়ে ধরব ভাবলাম। গিয়ে শুনি তুই একটু আগেই বেরিয়েছিস। তারপর থেকে আমাকে যা বলদের দৌড়টা করালি না! তোর অপিসে যাবার সময় একটা জিনিস দেখলাম। তোকে দেখাব আয়।

অবিনাশ বংশীর হাত ধরে টেনে নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর পাশের গলির দিকে এগোয়।

—ওদিকে কোথা যাবি? পাঁচটা একত্রিশ মিস্ করাবি কিন্তু। তারপর সেই ছ'টা চার শান্তিপুর—

—আরে আয়ই না। একদিন না হয় একটু দেরীতে যাবি। তোর বউ

এমন কিছু খুকী নয় যে ঠোঁট ফোলাবে। ঐখানে ট্রামডিপোর পেছনে বিজলি লেনে আমাদের কাঁচড়াপাড়ার ভোলা মিস্ত্রির মোটর গ্যারেজটা মনে আছে? আরে মদনের গ্যারেজ রে। মদন তো মারা গেছে অনেকদিন। তারপর থেকে ভোলাই চালায়। আই-টি-ও আপিস থেকে বেরিয়ে ভোলার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। ভাবলাম ওর গ্যারেজটা হয়ে তোর আপিসে যাব। আসবার পথে বাঁ হাতি যে খোলার চালের ধোপাদের বস্তিটা আছে ওটারই একটা ঘরের দাওয়ার দিকে চাইতেই আমার চোখ আটকে গেল। মনের খটকাটাকে কাটাবার জন্যে ফিরে গিয়ে আবার ভোলাকে জিজ্ঞেস করতে অনেক কথাই জানতে পারলাম।

—আরে ধুত্তোর। কি দেখলি তাই বল্ না। খামোকা হেঁয়ালী করছিস কেন?

—তাই দেখাতেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছি।

ওই তো এসে গেছি। ওই দাওয়াতে সতরঞ্চি পেতে যে চারটে লোক তাস পিটছে ওদের মধ্যে রাস্তার দিকে মুখ করে বসা ডানদিকের লোকটাকে দেখ। অতটা সিধে তাকাসনে তা বলে। চলতে চলতে দেখ।

—চেনা চেনা লাগছে ঠিকই। কোথায় দেখেছি বলতো?

—বাঁ হাতের কব্জির দিকে তাকা। যে হাতে তাস ধরে আছে।

—শ্বেতির দাগ! ও, এতো সেই ট্রেনের কামরায় গান গেয়ে ভিক্ষে করে সেই লোকটা না? কিন্তু তা কি করে হবে, সে লোকটা তো অন্ধ রে।

—আরও আছে চল। ট্রাম রাস্তায় পাঁচিলের ধারে ঝুপড়িগুলোর মধ্যে দেখতে পাবি। এই লোকটার নাম—ভোলার কাছে জানলাম, খোকনদা। পাড়ায় এক হাফ মস্তান। তবে রোজগারের অনেক ধান্দা আছে।

অবিনাশ বংশীকে নিয়ে ফিরে আসে বড় রাস্তায়। আড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আগুপেছু দুটো ট্রামগাড়ীকে পাশ কাটিয়ে। সামনেই ফুটপাতের কোণে তখন সাজানো তিনখানা আধলা ইটের অনেকগুলো চুলোয় পাশা-পাশি একটু দূরে দূরে আগুন জ্বলছে। অবিনাশের ইঙ্গিতে বংশী দেখলো এক জায়গায় চুলোর ওপর চাপানো একটা মস্ত মাটির হাঁড়িতে বোধহয় ভাতই ফুটছে। সামনে দাঁড়ানো গোটাতিনেক ন্যাংটো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। সম্ভবত বাচ্চাগুলোর মা অথবা ঐ রকম কেউ হবে, একটি আধবয়সী স্ত্রীলোক এক হাতে কাঠকুটো

দিয়ে আগুনটা উস্কে দিয়ে চলেছে এবং আরেক হাতে একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে সেই প্রকাণ্ড হাঁড়িটার ভেতর মাঝে মাঝে ঘেঁটে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে মুখে অবিশ্রাম কারও উদ্দেশে বাংলা হিন্দী মেশানো এক খিঁচুড়ী ভাষায় অকথ্য সব বিশেষণ প্রয়োগ করে চলেছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিলে, মেয়েটা তারপরে চেঁচিয়ে উঠল।

—আরে এ হারামখোর কা বিটিয়া, এ শান্তি, তু কি কানের মাথা খেইএছিস। বাচ্চাটো ঘণ্টা ভরসে চিল্লিয়ে চলেছে-হারামজাদী ঘরের ভিতরে মজা কর্‌তেছে। পাঁচ আবাগীর এক দরজন্ বাচ্চা লিয়ে হামার যন্তো ঝঞ্ঝট্। খিলাও, নাহাও, খানা বানাও। এ বিন্দা! কাঁহা ভাগা রে! তামাম খানা কি হামি বানাবে? তুরা সব গিল্‌বার লেগে আছিস?

বাঁ দিকের একটা ছেঁড়া চট ও নীল রংয়ের পলিথিন শিটের ক্ষুদ্র তাঁবুর ভেতর থেকে একটা অল্প বয়সী মেয়ের মুখ উঁকি দিল। একটু ঝাঁঝালো স্বরে হেঁকে জবাব শোনা গেল—

—মাসি আমাদের শুধু শুধু বকছ কেন? সেই দুপুর থেকে আমি আর পিন্টি বাদাম ভাজার পেকেট বানাচ্ছি। পাঁচশো পেকেটের কম হলে কারও রক্ষে থাকবে না। মালিক গুনে লিবে। না হলে রাতের খানা বন্দ। বিন্দা খানা বানাতে গেলে কাল রেলে বাদাম বিক্রিও বন্দ।

বোঝা গেল এই মেয়েটির নামই বিন্দা বা বৃন্দা অথবা এই রকম কিছু একটা। বৃন্দার গলার আওয়াজ শুনেই সম্ভবত, একটু দূরে একটা চাটাই ও সিনেমা পোস্টারের আচ্ছাদনে ঢাকা অপর একটি তাঁবু থেকে একটি মোটামুটি ফর্সা ধারালো মুখশ্রী ও পাতলা গড়নের একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। পরণে একটা ময়লা সস্তা রঙিন ছাপা শাড়ী। মেয়েটার মুখ দেখে বংশী চমকে উঠল। এ মুখ মোটেই তার অপরিচিত নয়। রেলের কামরায় বহুদিন একে দেখেছে সে অন্ধ ভিখিরিটাকে হাত ধরে নিয়ে ভিক্ষে করতে। তখন এর পরণে একটা শতছিন্ন ময়লা ফ্রক দেখে একে তের চোদ্দ বছরের বেশী মনেই হয় না। এখন মনে হচ্ছে খুব কম হলেও কুড়ি বাইশের নিচে মোটেই নয় ওর বয়স। অবিনাশ বংশীর বিস্ময় বুঝতে পেরে ওকে কনুই ধরে টেনে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে বলে, মেয়েটাকে দেখাতেই এখানে তোকে নিয়ে এলাম। ওই ফুটে চল।

ট্রামলাইন পেরিয়ে ওরা উল্টোদিকের ফুটপাতে ভাঙা চোরা গাড়ীর পার্টসের

এক দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অপর ফুটপাতে মেয়েটা তখন রণরঙ্গিনী মূর্তিতে চেঁচাতে সুরু করেছে।

—অ-রে আমার নবাবের বান্দী। আমরা অইলাম হারামজাদী। তর যম্ম পোলারে জিগা গিয়া ডজন ডজন বাচ্চা কোন্ খান্ থিকা আসে, ক্যামনে আসে। পাঁচ আবাগী জুটোইল কেডা। তর কোন্ বাপে। ঘর গেরাম থেকা ফুস্‌লাইয়া ফাস্‌লাইয়া আন্‌ল কে। তরে বিয়া করুমু। ঘর সংসার দিমু। দিছে ঘর সংসার। ফুটের ঘর। কানি ন্যাতার ঘর। আর সংসার তো বাইড়াই চলে বছরে বছরে। ভাতারের যার হাঁদস নাই, তার বাচ্চার বাপেরও ঠিক নাই। থাকবো ক্যামনে। রাইত অইলেই তো শিয়ালের পাল আসমান ফাঁইড়া ঘরের ভিতরে স্যান্ধায়। ঘুমী মাইন্‌সের মাংস খুব্‌লাইয়া খায়। তারপর তিন্‌ডা মাসও যায় না। পলায়।

মাসীর গলার আওয়াজও শোনা যায়। তবে অত উচ্চগ্রামে নয় এবার এবং ঝাঁঝও অনেক কম।

—মাসী এউক্‌গো রুটি দিবা। ক্ষুধা লাগ্‌ছে জব্বর। একটি বছর পঁচিশ ছাব্বিশের হাফ প্যান্ট পরা ছোকরা একটা সওয়ারীহীন হাত রিকশা ফুটের পাশেই রেখে পাশের হাইড্রান্টের গঙ্গাজলে পা হাত ও মুখ ধুয়ে এক মুখ জল কুলকুচো করে ফেলে দিয়ে মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলে। আর তারপরই বোধহয় বচসার ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে বলে,—কি রে শান্তি তর হইলটা কি? মাথায় আগুন লাগছে নাকি! রহমান গেল কৈ। জ্বর কমছে! হালারে কইলাম রিক্‌শা চালাইয়া খাইতাছস্ তাই কর্। না সে হালায় কয় সিনেমার টিকিট বেলাক করুমু রাইতে। জেয়াদা কামাই। হিন্দে নূতন বই লাগ্‌ছে। তা বেপাড়ার মস্তানগো হাতে আদর খান্ আচ্ছাই জুটেছে। প্যান্দাইয়া লাশ বানাইছে। মইধ্যরাইতে আইয়া বুঝি তর ঝুপড়িতে ঢুক্‌ছে। জ্বরে বেহুঁশ। পাঁচর লগে শোন্‌লাম বিহানে। মাসী ভাতের ফ্যান গরম থাকে এট্টু দিয়া আসো। আরাম পাইব বেচারায়।

বংশীর চোখের সামনে যেন সিনেমার পর্দায় ঘটনা পরম্পরা মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে একের পর এক। ওর চিন্তার খেই পথ হারায়। কারা এইসব স্থানচ্যুত মানুষ। কিভাবে সমস্ত সম্বন্ধের জট পাকিয়ে এরা জীবন যাপন

করে। জট পাকিয়ে না জট খুলে ফেলে ঠিক বুঝতে পারে না বংশী। কে কার বাবা মা, ভাই বোন স্বামী স্ত্রী, মাতা পুত্র বোঝা মুস্কিল। এদের কে হিন্দু কে মুসলমান কোন ঠিকানা নেই। অথচ এদের ঘরেও সুখ দুঃখ আছে। ঝগড়া ভালোবাসা আছে। জন্ম আছে। মৃত্যু আছে। ফুটপাতের ওপরই কিংবা গাছতলায় অথবা পার্কের কোন কোনায়। এদের বাচ্চারাও বড় হয়। পথে পথেই। কারণ পথই এদের ঘর, সম্পর্ক এদের পরস্পরের মধ্যে আছে একটা অবশ্যই। সে সম্পর্ক হয়তো বা দারিদ্র্যের অথবা ফুটপাতের প্রতিবেশীত্বের। এদের পুরুষেরা কাজ করে। রিকশা টানে, ঠেলা চালায়, মোট বয়, জুতো পালিশ করে, ছোট খাটসওদার হকারীও করে অথবা ভিক্ষে করে, পকেট মারে, ছিঁচকে চুরি করে, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করে কিন্তু ডাকাতি করে না কিংবা ওয়াগন ভাঙে না। সে সাহস এদের নেই। মেয়েরাও কাজ করে যে যা পারে। ঝি গিরি অথবা অন্যকিছু আর ভিক্ষেতো আছেই। কিন্তু বেশ্যাগিরি কখনোই নয়। যার সঙ্গে থাকে সংসারের ধর্মেই থাকে পয়সার বিনিময়ে নয়। অথচ এদের নাম ভোটার লিস্টে ওঠে না। এরা আন্দোলন করে না, মিছিল করে রাস্তা বন্ধও করে না। বংশীর হঠাৎ অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তার নিজের স্ত্রী ছেলে মেয়ের কথা মনে পড়ে। ভাড়াটে বাড়ী হলেও ছোট্ট সুখী গৃহকোণ। আরামপ্রদ বিছানা এবং আরও কত সব ছোট ছোট অপ্রয়োজনের আয়োজন-প্রাচুর্য। রবিবার ও ছুটির দিনে আরও একটু দেরী করে ওঠা। আরও এক পেয়ালা চা। আরও একটু বাড়তি আরাম! ইনসিওরেন্স পলিসি—প্রভিডেন্ট ফান্ড—এক্‌স্‌গ্রাসিয়া পেমেন্ট। রেবার গলা কানে আসে।—ওগো সামনের মাস থেকে আমাকে তুমি আলাদা দশটা করে টাকা দিও। পোষ্ট আপিসে রেকারিং ডিপোজিট খুলব একটা তুতুলের নামে। পাঁচ বছরে কত পাওয়া যাবে জানো।—

ভগবান দাসের নাম লেখা একটা বিশাল বাস ছুটে চলে যায় হাওয়াই হর্নের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে। মন্থরগতি একটা ট্রামকে পাশ কাটিয়ে। বংশীর চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। সামনের ফুটপাতের ঘটনার জগতেও একটা নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দেয় এই সময়ে। হাতের কব্জিতে শ্বেতির দাগ ওয়ালা লোকটা কোথা থেকে যেন উদয় হয় এবং স্বভাবসিদ্ধ শ্যামা সঙ্গীতের গলা কাঁপানো স্বরের বদলে কর্কশ বিষাক্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—

—কি বে শালী হারামজাদী। মারব মুখে তিন লাথি। দূর করে দেব এখান থেকে। বড় তেল হয়েছে না? আমার পয়সায় খাবি আর আমারই ছেরাদ্ধ করবি। না খেতে পেয়ে মরছিলি গাঁয়ে। রাস্তা থেকে তুলে এনেছি। এখন তেল দেখাস।

গোলমালের হট্টগোলেই বোধ হয় শান্তির ঝুপড়ির দরজার ফাঁকে আর একটা মুখ বেরিয়ে আসে। এক মাথা চুল উসকো খুসকো। রক্তবর্ণ চোখ। গায়ে একটা ময়লা ছেঁড়া কাঁথা এলোমেলো জড়ানো। বছর উনিশ কুড়ি বয়সের একটি ছেলে হবে। গায়ের রং বেশ কালো। মাথা সোজা রেখে বসতে পারছে না। মনে হল বেশ অসুস্থ।

—আমি যাইরে শান্তি এখেন থে। খামোকা অশান্তি তোর।

রহমানের গলার আওয়াজে শান্তি ঘুরে তাকায় পেছনে। তারপর বলে,

—তরে যাইতে কে কইলো? শরীলডা এট্টু ভালো লাগতাছে বুজি! অমনি যাই। সব শিয়ালের এক রা। যা ভিতরে। শো গিয়া। যাবি ক্যান্ এডা অর বাপের ভিটা?

একটু দম নিয়ে ফের সামনে তাকায়। হিংস্র চোখে সম্মুখের লোকটাকে আক্রমণ করে বলে,

—কে রে আমার লাথি মারনেওয়ালা! আয় মার লাথি দেইখা লই। রাস্তা থিকা উঠাইয়া আইনা অট্টালিকায় রাখছে। আমারে খাইতে দ্যায়, তরু পয়সায় আমি খাই? না আমাগো পয়সায় তুই খাস রে হারামজাদা!

এতক্ষণে পঞ্চি, বৃন্দা সব এসে শান্তির পাশে দাঁড়িয়ে যায়। রিক্শা ওয়ালা ছোকরাও ওদের পক্ষ নিয়ে বলে,

—ইটা কিন্তু ভালো হইতাছেনা গরুরু। শরীলে তোমার মায়া দয়া কিছু নাই। ভালো মাইয়াডারে অনর্থক খুঁচাইয়া কতগুলা……

ততক্ষণে পথের চলমান জনস্রোতের বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষ মজা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কাছাকাছি। বাচ্চাগুলোর কান্নাও কখন থেমে গেছে। অবিনাশ আর দাঁড়াতে চায় না। বংশীর হাত ধরে টান দেয়। বংশী অন্যমনস্কভাবে ওর সঙ্গে এগিয়ে যায়। তার মাথার মধ্যে অনেক প্রশ্ন। অনেক ছবি এসে ভিড় করে। অবিনাশও কেমন যেন চুপ মেরে যায়। মুখ বুঁজে হেঁটে চলে। পাঁচটা একত্রিশের নৈহাটি লোকাল পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এতক্ষণে ছেড়ে গেছে নিশ্চয়ই। কাঁচড়াপাড়ায় একই পাড়ায় দুই প্রান্তে থাকে দুজন ওরা। তাই আলাদা অপিসে কাজ করলেও একসঙ্গেই রোজ যাতায়াত করে। সকালে আটটা পঞ্চাশের কাঁচড়াপাড়া লোকাল আর বাড়ী ফেরার পথে এই নৈহাটি লোকালটাই সবচেয়ে সুবিধে। ব্যারাকপুর পার হয়ে গেলেই ওরা মানসিক ভাবে বাড়ী পৌঁছে যায় যেন। হালিশহরের পর দরজার সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়। কাঁচড়াপাড়া স্টেশানে নেমে একটু ডানদিকের সোজা রাস্তাটা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই হারনেট স্কুল। তারপর রাস্তাটার একটা মোড় পর্যন্ত একত্র এসে দুজনে দুদিকে বাঁক নেয়।

হঠাৎ আচমকা প্রশ্ন করে অবিনাশ,—বংশী ভুট্টা খাবি? সামনে তাকিয়ে বংশী দেখতে পায় একটা লোক ফুটপাতের পাশেই একরাশ কাঁচা ভুট্টা নিয়ে বসে আধাজ্বলা কাঠকয়লার আংরাটায় প্রাণপণে হাওয়া করে চলেছে। সামনে একজন খরিদ্দারও দাঁড়িয়ে। অবিনাশ অবশ্য মুখ বুঁজে পথ চলতে একদম পারে না। হয় টুকটাক কিছু একটা কিনে মুখ চালায় অথবা ক্রমাগত বকবক করতে ভালবাসে একটা না একটা কিছু নিয়ে। তা সে হাঁটা পথেই হোক আর রেলগাড়ীতেই হোক। এই তো দিন তিনেক আগেই বাড়ী ফেরার পথে এক মুড়িওয়ালা ছোকরাকে নিয়ে রীতিমত একটা হৈ-চৈ ও নাটকই সৃষ্টি করে ফেলেছিল রেলের কামরায়। আর তারই একটা সূত্রেই হয়তো আজকের ঘটনার পরিস্থিতিটাকে আরও জটিল ও নাটকীয় করে তুলেছে। বংশীর মত অবিনাশও দুদিনের দুটো ঘটনার এই আকস্মিক যোগাযোগটাকে নেহাতই কাকতালীয় বলে মেনে নিতে পারছে না, এবং তাই তার ভুট্টা খাবার এই প্রস্তাবটা শুধু প্রসঙ্গান্তরে যাবারই চেষ্টা মাত্র। বংশী সম্মতি জানায়। নুন লেবু মাখা গরম গরম পোড়ান ভুটায় কামড় দিতে দিতে ওরা এগিয়ে চলে। রাস্তার ভিড় ও প্রচণ্ড কোলাহল ওদের কানেই ঢুকছিল না যেন। অবিনাশই আবার নীরবতা ভাঙে। আচ্ছা বংশী তুই তো রোজ এই পথেই বাড়ী ফিরিস। আমিও প্রায়ই তোর সঙ্গে যাই। কিন্তু কই সজ্ঞানভাবে কোনদিন এদের দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো।

—হ্যাঁ, চোখ দিয়ে দেখলেও সচেতন মন দিয়ে দেখি নি। কত কিছুই তো আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় তার কতটুকু সত্যি আমরা দেখি।

—কিন্তু এই যে অসহায় মানুষগুলো খড়কুটোর মতন সমাজের আনাচে

কানাচে ভেসে বেড়াচ্ছে এর জন্যে কারো কোন মাথাব্যথাই নেই। আমরা সমাজ বলতে মধ্যবিত্ত, বড়জোর নিম্নবিত্ত পর্যন্ত বুঝতে পারি। তার নিচেও যে কোন অস্তিত্ব আছে তা জানি না। জানলেও তাদের পথের কুকুর বেড়ালের বেশী মূল্য দিই না। বুঝলি পায়ের তলায় চোরাবালির যে বিরাট ধ্বস নেমেছে অনুভব করেও তাকে আমরা অস্বীকার করতে চাই।

বংশীর মাথার ভেতর অবিনাশের কথাগুলো ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনির মত যেন বিভিন্ন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। পায়ের তলায় চোরাবালির বিরাট ধ্বস নেমেছে···ধ্বস নেমেছে···। সে কোন কথার জবাব দেয় না আর। দিতে ভালো লাগে না। নীরবে হেঁটে চলে। অপরাধ বোধের একটা কাঁটা হয়তো নিজের মনেও বিঁধতে থাকে ওর। ভিন্ন প্রদেশ থেকে রোজগেরে কিছু লোক ইচ্ছে করেই ফুটপাতের জীবন বেছে নেয় হয়তো ; খরচ কমিয়ে দেশে পাঠানো টাকার অঙ্ক বাড়াবার জন্যে একথা বংশীর অজানা নয় কিন্তু নিজের দেশের গ্রামীণ দরিদ্র মেহনতী মানুষের একটা মস্তো অংশ যে আজ নিতান্ত নিরুপায় হয়েই পথে এসে দাঁড়াচ্ছে এর খবর না রাখাটাও তো কম অপরাধ নয়। খুব ছেলেবেলার একটা ছবি তার আজও মনে আছে। শুধু একটু ভাতের ফ্যান পাবার জন্যে কঙ্কালসার মানুষের দল কেমন করে পথের কুকুরের মত কাড়াকাড়ি করে মরেছে। কিন্তু সে মন্বন্তর—আকাল—যদিও ছিল মানুষেরই সৃষ্টি—লোভী মানুষের—তখন ছিল বিদেশী শাসন। কিন্তু আজ এই উনিশশো উনআশী সালে!

তিনদিন আগের ঘটনাটা আর একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল বংশীর। সেদিনও বাড়ী ফেরার পথে পাঁচটা একত্রিশের নৈহাটি লোকাল। একটু আগেই স্টেশানে পেঁছেচে ওরা। গাড়ী তখনও দেয়নি। বেশ ভিড় প্ল্যাটফরমে। ওরাও দাঁড়ায় আর সবার মত একটা কামরার দরজার অবস্থানটা অনুমান করে নিয়ে। গাড়ী এল। প্রায় খালিই বলা চলে। একেবারে থেমে যাবার আগেই নামবার যাত্রীদের ঠেলে প্রায় আবার গাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েই লোক উঠে পড়ে। বংশী আর অবিনাশও ওঠে। উঠে দেখে গাড়ীতে ওঠবার আগেই কিছু আরও সেয়ানা লোক জানলা গলিয়ে রুমাল, খবরের কাগজ, বই ইত্যাদি ছুঁড়ে দিয়ে এদিকের জানার ধারের সিট-গুলো প্রায় দখল করে রেখেছে। যাইহোক আরও অনেক ভাগ্যবানের মত

ওরাও বসবার জায়গা পায় প্রায় পছন্দমতই। নিয়মিত সময়ে একই ট্রেনে যারা যাতায়াত করে বিশেষ করে ডেলিপ্যাসেঞ্জারেরা প্রায় সবাই সবাইকে অল্প বিস্তর চেনে। ট্রেন প্রায় চলতে সুরু করেছে এই মুহূর্তে আধময়লা ধুতি ও শার্টপরা ফর্সা লম্বা প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বগলে একটা ফোলিও ব্যাগ, এক হাতে একটা নেসলেস্ বেবি ফুড ও আরেক হাতে মস্ত একটা ইলিশ মাছ নিয়ে লাফ দিয়ে কামরায় উঠে পড়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলেন। ভিড়ে ঠাসা কামরাটায় অনেকেই তাঁকে চেনে। বংশীদের বাঁ দিকে জানালার ধারে মুখোমুখি বসা জনাছয়েকের একটি দল যারা এতক্ষণে নিজের নিজের হাঁটুর ওপর রাখা ব্যাগ বা খবরের কাগজের ওপর তাসের সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছিল, প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—এসো এসো নেপুদা।

ভদ্রলোক সকলের কমন নেপুদা। দারুণ আমুদে। সমস্ত পথটা জমিয়ে রাখেন ব্যারাকপুর পর্যন্ত।

—আজ কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল? এই বাজারে আস্ত একটা বিরাট ইলিশ! জামাই ছোকরা তো আচ্ছা বে-আক্কেল।

নিজেরা একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে নেপুদার জন্যে বসবার জায়গা করে দিয়ে তাসের দলের একটি ছেলে মন্তব্য করল।

অবিনাশের পাশেই বসে পড়ে মাছটা বেঞ্চির নিচে ঢুকিয়ে দিতে দিতে নেপুদা বললেন—না হে, জামাইটামাই নয়। বহুদিনের বকেয়া প্রায় তামাদি হয়ে যাওয়া একটা ধার একজনে হঠাৎ আজ শোধ করে দিলে। তাই ভাবলাম টাকাটা তো গেছিলই সুতরাং একদিন একটু বিলাসিতা—। তা তুমি ওটা কি খেললে হে রাধু? হরতনের নওলাটা থাকতে! হাতে দু-দুটো স্পেড রয়েচে।

পাশের ছেলেটিকেই উদ্দেশ্য করে বললেন নেপুদা। তারপর ডানদিকে তাকিয়ে এতক্ষণে বোধহয় লক্ষ্য করলেন অবিনাশ ও বংশীকে।

—কি খবর মানিকজোড়? অবিনাশ একটু হাসে শুধু উত্তরে।

—মাছটা কত হল নেপুদা? বংশী প্রশ্ন করে।

—সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না ভায়া। দাম শুনলে খাওয়ার আগেই গলায় কাঁটা বিঁধবে। একুশ টাকা কেজি। এখন বোঝ।

গাড়ী ঘুঘুডাঙায় পেঁছয় এতক্ষণে। দমদম জংশন। কিছু লোক নামে। ওঠে অনেক আরো। সেই সঙ্গে একদল হকার বা ভেন্ডারও। সকলের

সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে বিচিত্র এক কোলাহলের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতে কারোই কোন ব্যাঘাত হয় না। তাস খেলুড়ে দলেরও নয়। এতক্ষণে তাদের দ্বিতীয় কিস্তি আরম্ভ হয়ে গেছে।

—চাই বাদাম ভাজা। সল্টেড বাদাম। বিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা, এক টাকা প্যাকেট।

—চাই বাদাম ভাজা।—চা-চা-চা চাই গরম চা। —ঝাল মুড়ি, মশলা মুড়ি —চাই মশলা মুড়ি। —এই যে দাদা কারও কলম লাগলে বলবেন। মাত্র এক টাকা করে পাচ্ছেন। কিং কোম্পানীর ফাউটেন পেন। তাস খেলুড়েদের একজন ডাকে,—এই নিতাই এদিকে দুটো বিশ পয়সার প্যাকেট দিয়ে যা। প্যাসেঞ্জারদের মতন ভেণ্ডারাও প্রায়ই সবার পরিচিত। বুক খোলা খাকি শার্ট ও হাফপ্যান্ট পরা বছর পনেরোর একটা কালো ছেলে বাদাম ভাজার দুটো প্যাকেট এগিয়ে দেয়। বংশীর চায়ের তেষ্টা পেয়ে যায়। চা ওয়ালাকে ডেকে নিজের আর অবিনাশের জন্যে দু ভাঁড় চায়ের ফরমাস করে। নেপুদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—নেপুদা চা চলবে?

—খাওয়াবে চা? তা বলো একটা। নেপুদা জবাব দেন।

হঠাৎ একটা গোলমালের আওয়াজে এই সময় সবাই অবিনাশদের ডানদিকে উল্টোদিকের জানালার কাছে বেঞ্চিটার দিকে তাকায়। একটা কিশোর কণ্ঠের তীব্র আওয়াজও শোনা যায়। তারপরেই একটি বয়স্ক লোকের গলা।

—কি করলেন! কি করলেন আপনি! ইচ্ছে করে অতগুলো জিনিস আমার ফেলে দিলেন।

—বেশ করেছি যা। যত্তো সব উটকো আপদ। ঘাড়ের ওপর দিয়েই যাবে। মানুষজন যে একটু শান্তিতে বসে যাবে তার জো নেই।

—তাই বলে আপনি ইচ্ছে করে আমার লোসকান করবেন। আমি কোতায় আমনার ঘাড়ের ওপর গেচি। এট্টু পায়ে ঠেকেচে তাই। আমি নমস্কার তো করেচি।

—এঃ, নমস্কার তো করেছি! নমস্কার করলেই সব দোষ কেটে গেল। সাত খুন মাপ।

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে ওপাশের ব্যাপারটা দেখতে চেষ্টা করে বংশী। ঘটনাটা বুঝতে খুব অসুবিধে হয় না তার। নীল হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জী গায়ে, মুড়িওয়ালা ছেলেটা বয়স বোধ হয় বছর বারো

তেরো হবে একজন গোঁফওয়ালা কাঠখোট্টা গোঁয়ার মত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ঝগড়া করছে। লোকটার পায়ের কাছেই তার মুড়ির টিনটা কাত হয়ে পড়ে আছে। আর চারদিকে একরাশ মুড়ি, পেঁয়াজকুচো, শশারটুকরো, ছোলাভাজা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গোলমালের ভেতর থেকেও বোঝা গেল টিনটা নিচে নামিয়ে রেখে ছোকরা কোন খদ্দেরের জন্যে মশলা মুড়ি মাখাচ্ছিল। টিনটা সম্ভবত এই লোকটার পায়ে লাগতে লোকটা পা ছুঁড়ে টিনটা কাত করে ফেলে দেয়। এই সময় বাদামওয়ালা ছেলেটা কামরার অন্য প্রান্ত থেকে এদিকে এসে পৌঁছয়। দৃশ্যটা দেখেই চিৎকার করে ওঠে—এ কি রে বটা! সব্বনাশ। সব মাল ফেলে দিইচিস! মালিক আজ রক্ষে রাখবে না। এই লোত্তি দেখে যা কি কাণ্ড।

আওয়াজ শুনে একটু পরেই ময়লা ফ্রক পরা একটা দশ এগারো বছরের মেয়ে—মুখ দেখে পশ্চিমা বলেই মনে হয়, এসে উপস্থিত হয়। এক মাথা রুক্ষ চুল তেল অভাবে প্রায় সোনালী রং ধারণ করেছে। বংশী চিনতে পারে এই মেয়েটা এতক্ষণ একটা পুঁটুলি কোলে করে কামরার দরজার কাছেই মেঝেতে বসেছিল। নিতাই এর ডাক শুনে এগিয়ে এসে মুড়ির দুরবস্থা দেখেই প্রায় চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—এ-মা, কি হবে এখন বটু! বলেই সে মেঝেতে বসে পড়ে ছড়িয়ে যাওয়া মুড়িগুলো দু হাতে জড়ো করতে থাকে।

অবিনাশের কৌতূহল সাধারণত একটু বেশী। তবুও এতক্ষণ সে ধৈর্য ধরে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেই যাচ্ছিল। এবার হঠাৎ আচমকা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—এই ছুঁড়ি কি হচ্চে? ওইগুলো আবার খাওয়াবি নাকি সবাইকে হাজার লোকের মাড়ানো নোংরা জায়গা থেকে তুলে!

—যা বলেছেন মশাই। যতো জঞ্জাল। তেমনি হয়েছে রেল কোম্পানী। মানুষকে একটু সুবিধে দেওয়া তো দূরের কথা যতো ভিখিরি আর হাভাতে ধরে এনে ভেণ্ডারের লাইসেন্স দেয়।—সেই গোঁফওয়ালা লোকটা টিপ্পনি কাটে।

—থামুন আপনি। বোমার মত ফেটে পড়ে অবিনাশ।—লজ্জা করে না আপনার! একটা বাচ্চাছেলের সারাদিনের পরিশ্রমের ফল লাথি মেরে ফেলে দিলেন। আপনি মানুষ না জানোয়ার!

মেয়েটা আচমকা ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে উঠে আগের জায়গায় ফিরে যায়। এবার আর বসে না। দরজার পাশের রডটা ধরে

দাঁড়িয়ে থাকে। হাওয়ায় ওর রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। বটা বা বটু তার পক্ষে সমর্থনের সাড়া পেয়ে এবার ভাঁ করে কেঁদে ফ্যালে। গাড়ী শুদ্ধ প্রায় সবাই যেন হঠাৎ সহানুভূতির গুঞ্জন তোলে। একজন মুড়ির টিনটা তুলে নিয়ে কৌটোগুলো গুছিয়ে রাখে। একজন মন্তব্য করে,—'তা টাকা তিন চারের মাল নষ্ট হয়েছে।' আরো কিছু উৎসাহী চাঁদা করে পয়সাটা তুলে ফেলার কাজে লেগে যায়। অবিনাশই প্রথমে একটা টাকা এগিয়ে দেয়। চার টাকা উঠতে বেশী সময় লাগে না তারপর।

নেপুদা উঠে গিয়ে ছেলেটাকে হাত ধরে কাছে নিয়ে আসেন। জিগ্যেস করেন,

—এই তোর নাম কি ?

—বটুক। বটুকেস্বর দাস। নিশ্চিত লোকসানটা হঠাৎ লাভে পরিণত হওয়ায় মুখের করুণ ভাবটা কেটে গিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে বটুকেশ্বর। স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দেয়।

—ঐ যে বাদামওলা ছেলেটা বলছিল জিনিষ লোকসান হলে মালিক রক্ষে রাখবে না। তা এগুলো কার জিনিষ রে ; তোর নয় ?

—না তো। আমি অত পয়সা কোথা পাব। এ সব তো কোম্পানীর জিনিষ।

—কোন্ কোম্পানী রে !

—কোম্পানী মানে মালিক। মানে যে জিনিষগুলো কিনে টিনে আমাদের বেচতে দেয়। আমরা জিনিষ বেচে সকালে টিপিনের আর রাতে ভাতের খোরাকি পয়সা পাই। আমি, নিতাই, আরো কজনা আছে।

—সে কিরে। এরকম ব্যবসাও আছে নাকি ? কে মালিক রে তোদের ? কত দেয় দিনে এক একজনাকে ? মাল যদি সব বিক্রি না হয় কি খেয়ে ফেলিস নিজেরাই তোরা !

—ধ্যাৎ তাই আবার হয় নাকি ! বিক্কিরির জিনিস কেউ খেয়ে ফেলে ? সব মাল বিক্রি হয়ে যায় বেশীর ভাগ দিনেই। না হলেও কিছু হয় না। আমরা খোরাকি পাই। সকালে টিপিনের আট আনা আর ভাতের জন্যে সন্ধে বেলায় আড়াই টাকা। মালিকের নাম থোকনদা। কোলকাতায় থাকে বেনে-পুকুরে। রোজগার রোজ মালের হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হয়। নষ্ট হলে ঠিক ধরে ফেলবে। হিসেব করা আছে এক এক কেজি মুড়িতে কত ঠোঙা

পঁচিশ পয়সার মাল পাওয়া যাবে পিয়াজ কুচো, শশা, নারকোল সব মেলালে। হিসেবের গোলমাল হলেই পয়সা কাটা যাবে আর মারও খেতে হবে।

—কোথায় থাকিস তুই !

—ঐ ঘুঘুড্যাঙায় রেল লাইনের পাশে। আগে একজনার দোকানের সামনে শুতুম। এখন নিজেরাই ঘর বানিয়ে নিয়েচি রেললাইন বস্তিতে।

—বাড়ীতে কে আছে তোর ? বাপ মা নেই ?

—বাপ মাকে আমি চোকেই দেকিনি। এখেনে আমি আর লেত্তি থাকি শুধু।

—লেত্তি কে ! ঐ মেয়েটা যে মুড়ি কুড়োচ্ছিল ! ও কে হয় তোর ?

—ও আমার বুন হয়।

—তোর বোন ? কেমন বোন ! আপন ?

—না। মার পেটের বুন নয়। ঐ আগে যখন আমি মামার কাছে ছিলুম না—বোটকথানা বাজারে ; তখন ওরাও ওখেনেই থাকত। আমার মামার আলু পিঁয়াজের দোকান ছিল তো বাজারে ! তা মামাও হঠাৎ পটু করে মরে গেল আর কিছুদিন পরই মামী আমায় বাড়ী থেকে তাইড়ে দিলে। লেত্তির মা ধানিয়া মাসীও ওখেনে শাকটাক বেচতো। আমায় খুব ভালবাসত। একদিন টামরাস্তায় বাশ চাপা পড়ে মাসী মরে গেল। আর ওর বাবা তো অনেক আগেই গেছিল। রেল কোম্পানীতে নাকি কাজ করত। লেত্তিকে দেখবার নাম করে ওখেনেই ওর এক গাঁতুতো কাকা নিয়ে গেল। ঘরের সব কাজ করিয়ে নিত তারা ওকে দিয়ে কিন্তুক পেট ভরে খেতেও দিত না। আমি এখেনে এই কাজটা পাবার কিছুদিন পর লেত্তিকে বল্লুম, তুই আমার কাচে থাকবি ? আমি যা খেতে পাব তার আদ্দেকটা ভাগ দিতে পারি। কিন্তুক কোনদিন পয়সা না পেলে খালি পেটেই রাত কাটাতে হবে সেটা মনে রাখিস। তা ও একটা কতাও না বলে সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলো। সেই থেকে দু বচ্ছর হয়ে গেল আমরা দুজনা ঘুঘুড্যাঙায় রেল বস্তিতে আচি। ও খুব ভাল মেয়ে। খালি সন্ধে বেলায় একা থাকতে ভয় পায় বলে বিকেলে আমার সঙ্গেই গাড়ীতে আসে। চেকার বাবুরা আমাদের সব্বাইকে চেনে। কিছু বলে না। আমার তো ভেন্ডার পাশ আচে।

—তা তুই নিজেই ধার ধোর করে মাল কিনে বেচিস না কেন ? তাতে লাভ তো অনেক বেশী রে।

—আমাদের কেউ ধার দেয় কখনো! আর দিলেই বা; লাইসেন কি দেবে আমায় রেল কোম্পানী? ও তো খোকন দা করায়। পয়সা লাগে অনেক লাইসেন পেতে। অনেক ধরা করা কত্তে হয়।...

হঠাৎ এক ট্রামগাড়ির প্রচণ্ড কর্কশ ব্রেক করার শব্দে বংশীর চমক ভাঙে। মৌলালীর মোড়। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে। চারদিকে কি প্রচণ্ড ভিড়। মানুষ, গাড়ী, ট্রাম, রিক্সা, সাইকেল, ঠেলা, হর্কার...। দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। অবিনাশ এতক্ষণে কথা বলে,—একটু আগেই পেঁছে গেলাম রে। মাত্র পোনে পাঁচটা। শান্তিপুর লোকালটার এখনও প্রায় মিনিট কুড়ি দেরী। স্টেশানে এক পেয়ালা চা খাওয়া যাবে বরং!

বংশীলাল মাথা নাড়ে শুধু সম্মতি সূচক, কোনকথা বলে না। ওর মনে পড়ে যায় কোথায় কে যেন লিখেছিল, কলকাতা শুধু একটা সিটি নয়, কলকাতা একটা মেট্রোপলিস। অর্থাৎ কলকাতা কেবল একটা শহর বা নগর মাত্র নয়। কলকাতা হচ্ছে একটা মহানগর। আর এখানে বাস করে যারা—প্রাসাদ থেকে ফুটপাতে পর্যন্ত—সবাই শুধু নাগরিক নয়; এক একজন মহানাগরিক। সে নিজে, অবিনাশ, নেপুদা, খোকনদা, শান্তি, বিন্দা, বটু—লেক্তি সব্বাই।

ঘর

শৈলেন চৌধুরী

আমি বুইতে পারিনি।

দক্ষিণ থেকে আছড়ে-পড়া বাতাসে গাছের পাতায় ঝড় ওঠে। বুড়িয়ে-যাওয়া বিবর্ণ দু একটা পাতা খসে পড়ে রাধামণির গায়ে বুকে। ওর আঁচল ওড়ে। কোমর পর্যন্ত নেমে আসা ঘন একরাশ রুখো লালচে মেরে যাওয়া চুল ঝাপট মারে চোখে মুখে। অভ্যাসবশে আঙুল দিয়ে ও সেগুলো সরিয়ে দেয়। নেহাৎই বে-খেয়ালে। আর তখনই বুকের ভেতর থেকে একতাল ভিজে মাটির মত কি যেন গলা পর্যন্ত এসে আটকে যায়। রাধামণির শরীর কেঁপে যায়। ও চোখে আঁচল চাপে। ফুঁপিয়ে কাঁদে। বলে, আমি বুইতে পারিনি!

তারিণী খুড়ো বলেছিলো, মাগীর সহুরের আঁচ লেগেছেলো গো, ত্যাখোন বোঝেনি, এখোন হিসেব এয়েছে, বাঁশ একখান সেঁধিয়ে গেছে যে পেছন দে।

বাতাসী আর বুঁচি দু'বোন তেড়ে এসেছে। খুশিতে যেনো ডগমগো। আমাদের বলার সময় মনে ছিলোনি, আমরা তো পেটের জ্বালায় গতর বেচে খাই, তুই কি রে ঢলানী, ঢ্যামনি মেয়েমানুষ! এতোদিন কার ছিচরণে সতী হয়ে ছিলি রে!

কথাগুলো যেন এখনও শুনতে পাচ্ছে রাধা। যেন অনেকগুলো ঢাকের বাজনা ধীর মন্থর লয়ে ওর কানের পর্দায় আছড়ে পড়ছে ধিনিক ধিনিক নেক্কা নেকুর, অবিশ্রাম উদ্দাম অশ্লীল নাচ? আর সেই নেক্কা নেকুর ধিনিক্ ধিনিক্ বাজনা। তাল লয় যতিহীন এলোমেলো।

রাধা স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে ভাবতে। ওর ছোট্ বুকের ভেতরকার হৃদপিণ্ডটা স্থির হয় না। সেই বাজনার তালে তালে ক্রমাগত ওঠানামা করে।

রাধামণি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না এ রকম হবার কারণ কি? সে যখন আরো ছোট ছিল বড়দিকে দেখেছে বাজারের তরকারীওয়ালা হরিপদর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত। কত রং, খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ত কথায় কথায়। তারপর কি হোল একদিন বাতাসী আর বুঁচিদের মতো লাইনে নেমে গেল। বাবা মা পরস্পরকে দোষারোপ, হাতাহাতি মারামারি করল, তারপর

দু'জনেই বসে কেঁদে কেঁদে মনের জ্বালা মেটাল।

মেজদিটাও কত নরম লাজুক প্রকৃতির ছিল। মায়ের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি খাটতে যেতো। বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড় কাচা, ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যেতো। তিন ইটের উনুনে কাঠের জ্বালে রাঁধত। সবাইকে খেতে দিতো।

সেই মেজদিও কেমন বিগড়ে গেল একদিন। মাকে বলেছেলো, আমার, ভাল লাগেনে!

মা বকত, ঝগড়া করত। মেজদি উত্তর দিতনা, বসে কি ভাবত।

এখন রাধামণির মনে হচ্ছে ওর বুকের মধ্যেও কি হু হু করত। একতাল ভেজা মাটির মতো কিছু একটু গলা পর্যন্ত হেঁটে আসত। ভাবতে বেশ কষ্ট হয় এখন। দিদিটাও একদিন চলে গেল আধবুড়ো পাঞ্জাবীটার সঙ্গে। বাবা বলল, মেয়ের বে দে দিছি, রঙ কলের ব্যারোয়ান, অঢেল রোজগার। মেয়ে আমার সুখে রয়েছে গো!

সত্যি কথা, পাঞ্জাবী মেজদিকে ছাড়েনি। দুটো ছেলে হয়েছে। দুবেলা খেতে পায়, সুখেই আছে!

রাধামণি সরে এলো গাছটার আড়ালে। বেলা পড়ে আসছে। ওর ছায়াটা এখন পুবে হেলেছে লম্বাটে হয়ে। খুপরিগুলো এখন বেশ সরগরম হয়ে উঠছে। ইটের উপর মাটির হাঁড়ি। কাঠের জ্বালের ধোঁয়া বাতাসে উড়ে বড় বড় বাড়িগুলোর জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ছে। মেয়েমানুষগুলো রান্নার সঙ্গে বাবুদের বাড়ির কেচ্ছা করছে, মুখে নুড়ো জ্বালছে।

মরদগুলো ফিরছে এই সময়। রিকশো জমা দিয়ে, হিসেব মিটিয়ে। কেউ কাঠের চুপড়ি মাথায়। শেষ বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা, অথবা নামমাত্র পয়সা দিয়ে কেনা পচা মাছের গন্ধ বাতাসে নাকে লাগছে।

রাধামণির উকিল বাড়ির মেজো বউ-এর কথা মনে পড়ে।

একটু চাকুরি রাধা?

দাও।

খেয়ে আর মুখ ফেরাতে পারে না। কি করে রাধে ওরা, কত মশলা, তেল, ঘি, কত সুখ ওদের। বেশি থাকলে বাসি রান্না কোন কোন দিন মেজ বউ দিত রাধামণিকে। রাধামণি গিলত। ছোট ভাই বোন কাউকে দিতে ইচ্ছে যেত না।

নন্দ ফিরেছে। খুপরি থেকে বেরুল। গামছা কাঁধে হাতে সাবান। চাপা কলে অনেকক্ষণ ধরে চান করবে, খাবে। বিড়ি ধরিয়ে বাবু সেজে

রাধামণির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে। আড়চোখে দেখবে। ওকে দেখে কে বলবে চাষার ছেলে এখন রিকশো চালিয়ে খায়। ফুটে ক্যাতায় শুয়ে থাকে। একটা ট্রানজিস্টর কিনেছে, হিন্দী গান শোনে।

নন্দ একদিন বলেছিল, তুই যা হয়েছিস না মাইরি, একেবারে হেমা মালিনীর···

রাধামণি খিঁচিয়ে উঠেছিল, তোর বাবার তাতে কি?

তোকে বে করতে মন চায়!

তোর মাকে বে করগে না।

নন্দ বলেছিল, মাগীর চোখে বাবুদের বাড়ির অং লেগেছে, হাত দে চাঁদ ধরতি ইচ্ছে গেছে। তুই মরবি।

রাধামণি ধমকে বলেছিল, তার মানেটা কি?

নন্দ বলেছিল, জানিনে ভাবছিস, সবাই জানে, টাইম বাবু তোকে রাণী বানাবে। ঝি-এর মেয়ে ঝি-কে খুব জোর দু'রাত কোলে বসাবে, একটা ছেলে দিবে, সংসার দিবোনি।

সেই মাটির তালটা আবার গলা পর্যন্ত এগিয়ে এসে থেমে আছে। চোখ ফুটো করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টাইম বাবুতো অন্য কথা বলেছিল। বিয়ে করবে বলেই তো নিয়ে গেছলো। রাধামণি অবিশ্বাস করতে পারেনি। কেমন যেন নেশার মতো লাগতো। না দেখলে মনটা উথালি পাথালি করত। প্রথমে রান্না আর বাসন মাজার কাজে ঢুকেছিল। একা মানুষ। তারপর তো সবই করে দিত। ঘর গোছান, কাপড় কাচা, নেকান-পোছান সব।

টাইম বাবু বুকে জড়িয়ে ধরত। রাধামণি বলেছিলো, আমায় সংসার দিতি পারবে?

টাইম বাবু মিষ্টি করে হাসত। তুই তো আমার ঘরণী রে। সবই তো তোর। আমি ইস্তক।

রাধামণি বিশ্বাস করত। আনন্দে বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ বাজনা বাজত। চোখ বুজে টাইম বাবুর বুকে মাথা রাখত। নিঃশব্দে এলিয়ে দিত নিজেকে। দিনান্তে বিশ্রামের মতো নিশ্চিন্তে।

টাইম বাবুর গোছালো ঘর। নরম বিছানা। কত রকম ভালমন্দ পেট-পুরে খাওয়া। মাথার উপর পাখার বাতাস। কি যে টান পড়ে গিয়েছিল রাধামণি বুঝে উঠতে পারে না। ধেনোর নেশার মতো। কখনও মনেই হয়নি

অন্য কিছু হতে পারে।

এখন ভাবতে বুকটা গুঁড়িয়ে ভেঙে যেতে চায়। বে করবে বলেই তো নিয়ে গেছলো। রেলে করে অনেক দূরে। হোটেলে থাকতো। কি সুন্দর ঘর, বিছানা, খাওয়া-দাওয়া। টাইম বাবু ওকে মদ খাওয়াতো, উদোম করে রাখতো।

রাধামণি বলেছিলো, আমায় বে করবে না? ঘর?

খিঁচিয়ে উঠেছিলো টাইম বাবু। এই তো ঘর রে মাগী। বিয়ে করে এ থেকে আর বেশি কি সুখ পাবি।

অনেক দূর থেকে টানা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। শব্দটা রাধামণি নিজে শুনতে পায়। রাধামণি গাছটাকে আঁকড়ে ধরে, বড় অসহায় লাগে। ভয় করে। বুকের ভেতরটা কাঁপে।

বাপটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যাচ্ছে। একরাশ বালতি নিয়ে কলে লাইন লাগাতে হবে। বাড়ি বাড়ি জল তোলার কাজ। যেতে গিয়ে থেমে যায়। রাধামণিকে দেখে। মাথায় হাত রাখে, এখেনে দাঁইড়ে রয়েছিস মা।

রাধামণি বলে, ভাল লাগছেনে বাপ।

দুঃখ করিস নে মা, আমাগোর ভগমান আছে।

বাপটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। এখোন থেকে রাত পর্যন্ত বাবুদের ড্রাম ভরবে। কলে ঝগড়া করবে। মারধোরও হয় মাঝে মাঝে। তখন মনের দুঃখে বলে মানুষটা, এখেনে আর থাকবোনি, দেশে গে পরের জমিতে খাটবো।

দেশে গিয়ে দেখেছে, কাজ নেই। পেটে খিল লাগিয়ে পড়ে থাকা।

কিন্তু একসময় ছিল মানুষটা বাপের সঙ্গে মাঠে যেতো। বুনতো, নিড়েন দিতো, লাঙল ধরতো।

এখনও সন্তানদের কাছে সেই গল্প করবে। বুক চিতিয়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বলবে, আমরা কি এই রকম রাস্তার কুকুর ছিলেম নাকি, আমাদের মান ছিল, জমি ছিল, বাড়ি ছিল, দশ গাঁয়ের মানুষ জানতো। বলে কথা-গুলো! কিন্তু সে নিজেও জানে, ছিল কিন্তু আজ নেই। ঘোষ বাবুদের পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে। হজম হয়ে গেছে। আর বেরুবে নি।

রাধামণিও জানে তাদের আর কোন উপায় নেই। জমির কথা শুনলে যে খোঁড়া মানুষটা এখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাকে কি আটকে রাখা যেতো। একথা বুঝতে কোন মন্তর লাগে না। তাদের এখানেই পড়ে

থাকতে হবে। বাবুদের বাড়ী ঝি-গিরি করে হাড় কালি হবে। বিনি পয়সায় ইজ্জত বিকোতে হবে। নয়তো বেশ্যা হতে হবে বাতাসী বুচিদের মতো। না পারলে থালা হাতে করে বেরুতে হবে ভিক্ষে করতে। তারিণী খুড়োর বউ যেমন বেরোত রোজ। বাবুরা, বুড়িমানুষ, চোখে দেখতে পাইনে, কটা পয়সা দ্যান। ভিক্ষে করে যখন ফিরে আসে তখন ঠিক দেখতে পায় বুড়ি। রাধামণি কতদিন বুড়ির সামনে গিয়ে নকল করে বলত, বাবুরা, চোখে দেখতে পাইনে, কটা পয়সা দ্যান।

বুড়ি হাসত।

তারিণী খুড়ো চেঁচাত, ওরে বেজন্মা কুকুরের জাত। আমাদের আবার ধম্ম কিরে? মানুষ হলিতো, আমরা কি মানুষ। আজ রাধামণির মনে হয় তারিণী খুড়োর কথাগুলো তার নিজের খুড়োর কথাগুলো তার নিজের বুকের দলা পাকানো ব্যথাটার মতো কথা। তার মতো চোখ দিয়ে ঝরে না, মুখ দিয়ে ধিক্কার হয়ে বেরোয়। বুড়োর তো সবই ছিল। নিজের জমি, বাড়ি, হাল, লাঙল। সবই মহাজনের পেটে হজম হয়ে গেছে। বুড়ো হাতখানা বাড়িয়ে ধরত, কুঁচকোনো চামড়া, অশক্ত, কাঁপা হাত। বলত, এই হাতে লাঙল ধরেছি, সোনা ফইলেছি।

চোখ দুটো জ্বলজ্বল করত। আবার নিবে যেত দপ করে। হাঁপাত। কিন্তু কাঁদত না। খিস্তি করত অবিশ্রাম। নিজেকে গাল পাড়ত, হয়ত নিজের ভাগ্যকে।

ওরে রাধা খাবিনি?

খেয়াল হয় রাধামণির। মায়ের দিকে তাকায়। যেন নতুন করে দেখে মাকে। মাথার চুলে সাদা ছোপ ধরেছে, চোখ দুটো গর্তের মধ্যে খুঁজে দেখতে লাগে। কয়েকখানা হাড় কেবল। কাপড়খানা ময়লা, বিবর্ণ। নতুন সময় কি রং ছিল আজ আর তা বোঝা যায় না।

ভিখিরর মতো। অথচ ভিক্ষেয় মায়ের ঘোর আপত্তি। খেটে খাব। খুব ভোরে, যখন সূর্য দেখা যায় না কেবল অন্ধকার ধোঁয়া আলো ফোটে সেই তখন বেরিয়ে যায়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাড়ি বাড়ি বাসন মাজা আর কাপড় ধোয়া। কখনও তো মায়ের বিরক্তি দেখেনি, মা কি ক্লান্ত হয় না।

ছেঁড়া কাঁথা। মাটির হাঁড়ি কলসী। পলিথিনের সীট। রান্নার ধোঁয়ায় কালি মেরে যাওয়া জামা-কাপড়। কেমন যেন হতশ্রী। বাবুদের

বাড়ির সঙ্গে পার্থক্যটা কত সহজে ধরা পড়ে। কটা কুকুর শুয়ে হাঁপাচ্ছে। ছোট ছোট ভাইবোনগুলো কুকুরের বাচ্চার মতো খেলছে ওদের সঙ্গে। রাধামণি বলে, আমি খাবনি, খিদে পায়নে।

ঢলানি করিসনে রাধা। আমাদের ওসব মানায় নে।

মায়ের কথায় রাগ। কিন্তু মা কখনও রাগে না। একটা চাপা অভিমান রাধামণির বুকের ভেতর শক্ত হয়ে থাকে। গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না।

বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাগুলো বসে পড়েছে খেতে। মাটিতে, গিলছে। বড় বেলুনের মতো ফোলা পেট। আরও ফুলছে। কুকুরগুলো এগিয়ে এসে সামান্য তফাৎ রেখে বসেছে। তাকিয়ে আছে।

আমি খাবনি!

মা বলে, তালে এখেনে মরতে এয়েছিস কেনে। অত যদি দুঃখু, গঙ্গায় ডুবতে পারলিনে। আমার হাড় জুড়োতো।

মা দাঁড়ায় না। এগুলোকে গিলিয়ে আমায় বেরুতে হবে, বিকেলের কাজে। ফিরতে রাত আটটা বেজে যাবে।

ক্রমে রাত হয়। রাস্তার নিয়নবাতি জ্বলে। সহরের মানুষের ব্যস্ততা। যাতায়াত। গাড়ির শব্দ। রেডিও থেকে ভেসে আসা হিন্দি গানের সুর।

খুপরিগুলোর ভেতর লম্ফ জ্বলে। নানান সাংসারিক কাজে এরা ব্যস্ত। বিচ্ছিন্ন মানুষগুলো সংসারের স্বাদ পায় এই সময়। পুরুষগুলো রাস্তার আলোয় তাস খেলে। মেয়েরা রাস্তার চাপাকল খুলে চান করে, শরীর জুড়োয়। বে-আব্রু অথচ আব্রুর মতো কিছু একটা রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা।

রাধামণি খুপরির ভেতর শুয়ে ছটফট করে। বুকটা জ্বলে যায়। মনে মনে বলে, হা ভগমান, আমি কেনে বুইতে পারিনি।

রাত গভীর হয়। রাধামণি বেরিয়ে আসে খুপরি থেকে। বাবা, ভাইবোনগুলো ফুটের ওপোর অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ফুটের সংসারের অন্য মানুষগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা দুটো কুকুর মুখ তুলে রাধামণিকে দেখলো।

রাধামণি নিশায় পাওয়া মানুষের মতো বড় রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিম দিকে এগোল। রাস্তার আলো জ্বলছে। নির্জন। দোকানপাট বন্ধ।

কোন মানুষের সাড়াশব্দ নেই। ও একেবারে গঙ্গার ধারে এসে থামল। ওপাশে শ্মশান। শ্মশানকালী। জায়গাটা অল্প অল্প অন্ধকার। কয়েকটা বড় বড় গাছ রাস্তার উপর ডালপালা ছড়িয়ে কেমন যেন থমথমে করে তুলেছে। রেল লাইন। ওপাশে শ্মশানের কাছে গুডস্‌ট্রেনের একটা বগি কাঠ বোঝাই পড়ে আছে। রাধামণির শরীর ছমছম করে উঠল। ভয় করছে। রাধামণি থামল না। সোজা ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। সে তো মরবেই। তবে ভয় করে কি হবে।

এখন ভাটা। জল একেবারে নীচে। অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। মাঝিদের নৌকোগুলোয় আলো নেই, ঘুমুচ্ছে বোধহয়। শুধু ওপারের শালকের কারখানাগুলোর আলো দেখা যাচ্ছে। টুংটাং বিচিত্র সব শব্দ শোনা যাচ্ছে এখান থেকেই। ভাটার জল দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে। কারখানা থেকে ছিটকে পড়া আলোগুলো কাঁপছে ক্রমাগত জলের ভেতর।

রাধামণি বসে পড়ল সিঁড়ির ওপর। ভয় করছে এখন, অসম্ভব ভয়। বাড়ির সবার কথা মনে পড়ছে। ভীষণ দুঃখ হচ্ছে তাদের জন্য। নিজের ভেতরকার জ্বালাটা যেন এক মুহূর্তে ভুলে গেল রাধামণি। ওই জলে ডুবে মরার কথা ভেবে শিউরে উঠল। শ্মশানকালীর কথা মনে হলো। ভূত-পেত্নির কথা। এই নির্জন সময় অল্প অন্ধকারে ওরা যদি আসে। ওই অপদেবতারা। রাধামণি হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে।

কিন্তু উঠতে পারল না। পা দুটো তার আঠার মত লেপটে গেছে সিঁড়ির সঙ্গে। পাশ ফিরে বসার শক্তিও তার নেই। এখানে বসেই জলের শব্দ শুনল। গঙ্গায় ওপারের কারখানাগুলো থেকে ভেসে আসা শব্দ।

সময় গুণতে পারেনি রাধামণি। এক সময় মুখ তুলে সামনের দিকে চাইতে অবাক হয়ে দেখল ওপারের কারখানাগুলোর চিমনির পেছন দিয়ে পাতলা আলো ফুটছে। ভোর হচ্ছে। এখুনি মাঝি-মাল্লারা জেগে উঠবে। বুড়োবুড়িগুলো হরিনাম করতে করতে গঙ্গাচানে আসবে! লজ্জা লাগতে লাগল। নিজের ওপোর রাগ হতে থাকল। একটা অসহায় মুরগীর মতো মনে হলো নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই যেন ভূত দেখে চমকে উঠলো। একটা চেনা মানুষ ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। মানুষটা ওর কাছাকাছি এসেই দাঁড়িয়ে পড়ল। রাধামণি দেখল, নন্দ। একহাতে তোবড়ানো পুরনো টিনের সুটকেস। অন্য হাত দিয়ে বগলে

চেপে ধরা সতরঞ্জি মোড়া বিছানা।

তুই এখেনে, এতো সকালে? নন্দ বলল।

সে কথার জবাব না দিয়ে রাধামণি বলল, তুই যাচ্ছিস কমনে?

নন্দ হাসে, জানিস নে, আমি চাকরি পেয়েছি, হাওড়ার চটকলে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

আর আসবিনে এখেনে?

না।

রাধামণির মনে পড়ল। নন্দ বলেছিল রিকশো চালিয়ে পয়সা জমাবে। দেশে গিয়ে মহাজনদের থেকে জমি বাড়ি ছাড়িয়ে নেবে। চাষ করবে। বলেছিল, তুই যাবি? দুজনে মিলে মাঠে খাটবো।

অস্পষ্ট অন্ধকারে দুটো ছায়া মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। জখম হয়ে যাওয়া আসা। বাসি কাপড়ের মতো গা ঘিনঘিন করা স্মৃতিগুলো ভোরের বাতাসের মতো হালকা মনে হলো এই মুহূর্তে। তীব্র বাঁচার ইচ্ছা ওকে অস্থির করে তুলল। ওপারের চিমনির পেছন দিয়ে আলো স্পষ্ট হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আছড়ে পড়া তীব্র যন্ত্রণা ধোঁয়া বাতাস রাধামণির মুখে, বুকে অস্থির করছে। রাধামণি উঠে নন্দর সামনে দাঁড়াল। বলল, আমায় নে যাবি তোর সঙ্গে?

নন্দ দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। জবাব যোগাল না মুখ দিয়ে। কেমন যেন ভারি হয়ে এল বাতাস দুজনের মাঝখানে। রাধামণি কি ভেবে হতাশ হল। বলল, থাক, আমি সঙ্গে গেলে তোর সম্মানে লাগবে।

ওপারের খেয়ার স্টিমার পাড়ে ভিড়ছে। এক্ষুণি ওঠা-নামা শুরু হবে। রিকশোর টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে। নন্দ দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। অস্পষ্ট আলোয় রাধামণি ওর মনের কোন কথাই পড়তে পারল না।

নন্দ বলল এবার, ইস্টিমার এসে গেছে চল রাধা। রাধামণি এক মুহূর্ত ওর চোখে কি পড়তে চেষ্টা করল। বলল, আমাকে তোর ঘেন্না করবে নি?

ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসল নন্দ। বলল, আমরা হলামগে চাষার ছেলে, বাবুদের এঁটোকাঁটা খেয়েই তো বেঁচে আছি, ঘেন্না করলে চলে!

ঠিক তখনই খেয়ার স্টিমার জোরে জোরে বাঁশি বাজাল।

পরবাস

জীবন সরকার

দূরে দূরে গ্রামগুলি দ্বীপের মত ভাসছে। এক ঝাঁক পাখী উড়াল দিল। বুঝিবা রওনা দিল নিজের বাসায়। ছপ্ ছপ্ করে হরিলাল বৈঠা ফেলছে। কাঁধের গামছা দিয়ে নিজের মুখটা মুছে নিয়ে বলল: আপনারে চিনন যায় না। অসুখ হয়েছিল নাকি? কি উত্তর দেব। বললাম, না। নৌকার পাশেই কোন একটা মাছ ওয়াশ দিল। চারিদিকে জল ছিটিয়ে গেল। সেদিকে হরলাল চোখ রেখে বলল 'বোয়াল'। অন্য মাছও হতে পারে। সে কথায় না গিয়ে বললাম,—দ্যাশে তো গণ্ডগোল নাই।

না, হেই রকম কিছু না। চোর ডাকাইতের ডর বেশী। একটা রাইতেও বাদ যায় না। কর্তা একটু সাবধানে থাইক্যান।

পরান ছাঁৎ করে উঠল। অজানা আতঙ্কে আমার গা শিউরে উঠল। আর কোন কথাই হল না। নিজের মনেই ভাবনা এল। হরিলালের দিকে তাকালাম। আজকাল এ-রকম বিরাট সুগঠিত দেহের মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। হাত-পা বুক লোহার ছাঁচে তৈরী। বললাম—হগলেই তো ভাল আছে। হরিলাল চারিদিকে একবার চোখটা ঘুরিয়ে উত্তর দিল—কোন রকমে বাঁইচা আছি। হগলেই চইল্যা গেল। দিন-দুপুরে ডর করে। আর থাকন যাইবো না।

নৌকা খালে নামলে হরিলাল লগি রেখে বৈঠা হাতে নিল। লোকটা ধলেশ্বরী নদী পিছনে রেখে এগিয়ে চলল। ছইয়ের নীচে বসে হরিলালের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। চোখটা যেন জ্বলজ্বল করছে। বুকের হাড্ডিগুলি স্পষ্ট ফুলে ফুলে উঠছে। বললাম—সব চইল্যা গেলে আমরা থামুকি! কেরাইয়া নাও বাইয়া দিন চলে না। তা ছোট কর্তা হিন্দুস্থানের খবর কন তানারা কি কয়।

শরীর অবসন্ন। ইচ্ছে করছিল না কথা বলতে। চোখ ঘুরিয়ে দূরের

নীল আকাশটা দেখতে চেষ্টা করলাম। মাঠময় ধানক্ষেত। সবুজের মেলায় ঢেউ খেলে বাতাস অজানা দূরের দেশে ভেসে যাচ্ছে।

দেশ ভাগের পর পাশপোর্ট করে এই প্রথম আসা। মনে একটা ভয় ছিল। কি হয় কি হয়। কেননা বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ একটা ছিলেন না। বাড়ী ঘর ফেলে হিন্দুরা প্রায় সকলেই চলে এসেছিল। কোন কোন বাড়ীতে বুড়োবুড়ি রইলেন। ইচ্ছা আবার বাড়ীতে এসে সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন। চৌদ্দ পুরুষের বসতবাটী সহজে কি ভোলা যায়—না কেউ ভুলতে পারে।

মা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। চিরকাল পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করবার অভ্যাস, ফলত কলে স্নান করতে পারতেন না। বলতেন এই দ্যাশে থাকুম না। চইলা যামু। নাওন যাইব না। আসলে তাঁর কিছুই ভালো লাগতো না। ভ্যাপসা ঘর। ছোট্ট জায়গা। রাস্তাঘাট মানুষজন কোলাহল কোনমতেই মেনে নিতে পারতেন না।

অবিশ্যি সেটাও তার পক্ষে দূষনীয় নয়।

খোলা মেলায় বাস করেছেন। বাড়ীর লাগোয়া কয়েকসারি ধান জমি। গরু লাঙল, টিনের ঘর এই সব নিয়েই ছিলেন। মা যাবার সময় বলে গেলেন—মরতে হয় চৌদ্দ পুরুষের ভিটেয় মরুম। তোগ সোনার দ্যাশে থাকতে চাই না। তোগই থাক। আর একটা কারণও ছিল। যা কিছু রয়েছে তা একেবারে ফেলে দিয়ে আসা যায় না। নেই নেই করেও কম নেই। মা গিয়ে যদি আস্তে আস্তে পাঠাতে পারেন মন্দ কি?

সেই থেকে একবার করে যেতে হয়। পাশপোর্ট ভিসা ঝামেলার জন্যে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মা বার বার চিঠি দিচ্ছেন তোদের পথ চাইয়া আছি! নারকেলের নাড়ু। তিলা কদমা সব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এইবার চকে ধান ভালই। তুই যে আম গাছটা লাগাইছিলি—সেই গাছটার বইল আইছে।

মার উপর বেশ রাগ হল। শুধু শুধু এখানে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। দুনিয়ার লোক চলে গেল। তিনি চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছাড়ছেন না।

এবার আর রাখবো না। ভয় নিয়ে যাতায়াত চলে না। নিজের দেশ নিজের কাজই অপরিচিত। চারিদিকে আতঙ্ক। এই বুঝিবা লুঠেরার দল ঘোড়া টগবগিয়ে এল। টাকা পয়সাও পাঠান যায় না। কাঁহাতক আর ওসব চালাকি চলে। অমুকের কাছ থেকে পঞ্চাশটা আম নিয়েছি তুমি দিয়ে

দিও। তার মানে পঞ্চাশ টাকা। অদ্ভুত ব্যাপার। মাকে তো এই সব বোঝান যাবে না। বললেই বলেন—'দ্যাশডারে ভাগ করল ক্যান। ড্যাকরা নিশ্বংইশা পাঁটারা। কার মাথায় বাড়ী দিছিলাম। তোরা বাধা দিতে পারলি না। ভাত খাইয়া মানুষ হস নাই, ছাই খাইছিলি।' এর পরেই মা কাঁদবেন। চোখের জলে কাপড় ভেজাবেন। কে বোঝাবে কার জন্য এই দেশ ভাগ হল। কেন হল। মা খালি বলেন—আমরা কোন বাধা দিলাম না। যেন আমরাই দোষ করেছি। আমরাই ভাগ করেছি।

কচুরিপানার দামে হরিলালের নাও আটকে গেল। বৈঠা রেখে লগি হাতে নিল। ছইয়ে ধান গাছের পাতা লেগে ছরর-ছরর শব্দ হচ্ছে। একটা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এখান থেকেই আমাদের বাড়ির দেবদারু গাছটা দেখা যায়।

বরাবর ঐ গাছটায় কার্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দিতাম বহু দূর থেকে দেখা যেত। আহা রে! কি আনন্দ ছিল। একবার এইখানে বাইচ হয়েছিল। ঘোড়া মারার দল আমাদের কাছে হেরে গেছিল। আহারে। কি সুখের ছিল। হরিলাল লগি ঠেলতে ঠেলতে বলল—আপনার লগেই যামুগা।

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। ছক থেকে বাইরে দাঁড়াল। উত্তর কি দেব। যদি শোনে ভাত মেপে খেতে হয়—হার্ট ফেল করবে। আমি তো ওর খাওয়া দেখেছি! রেশনে যা চাল দেয়—তা ওর দু'দিন যাবে না। ঘাটে নামতে নামতে বললাম—যাইবা ক্যান। আমি তো আর যামুনা।

হাছা কথা। হরিলাল খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠল। শাপলার বনে ঢেউ খেলে গেল। আহা কি আনন্দ! কি আনন্দ!

মাঠান—দ্যাহেন কে আইছে। বলেই বাড়ীর দিকে ছুটল হরিলাল। মা আমাকে পেয়ে কি যে করবে ভেবেই পেল না। গায়ে হাত দিয়ে দেখল শরীর খারাপ হয়েছে কিনা। খাওয়ার জন্য এটা আনে ওটা আনে। মানে উৎসব পড়ে গেল। পাড়া-পড়শীরা ছুটে এল।

বিদেশে যাদের কেউ রয়েছে তাদের কথা জানতে চাইল। খবর দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা মন্দ লাগলো না। অথচ এই সব সুখস্মৃতি ফেলে চলে যেতে হবে। ঘাট থেকে নৌকা ছাড়লে বাড়ীর কুকুরটা পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গরুগুলি জাবর কাটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাবে। মা—গোপনে কপাল ফাটাবে। তখন—তখন—না যাবোই না।

ক'টা দিন কিভাবে কেটে গেল। কি করেছি। কোথায় গিয়েছি। কিছুই বলতে পারছি না। ভিসার মেয়াদ আর বেশীদিন নেই। এখনো ইলিশের ঝাল দিয়ে খাওয়া হল না। কবে যাব—দিন যে যায়-যায়। মোহনগঞ্জে পাতক্ষীর আনতে যেতে হবে। মা পাটি সাপটা করবে বলেছিল। না—আর যাবো না। সারেণ্ডার করব। পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে যাব। বৈরাগীর মন নিয়ে আর বাঁচার উপায় নেই।

প্রথম চোখ খুলে যাদের দেখেছি—শৈশবকাল যেখানে কেটেছে—কোথায় কি আছে না আছে এক নাগাড়ে বলে দিতে পারি। আমগাছ কার বাড়ীতে ক'টা আছে সব নখদর্পণে। জরিনা কোন গাছতলায় করমচার আচার খেতে দিয়েছিল এখনো মনে আছে। তা নিয়ে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল। আগমনী তো বলেই ফেলল—তোর লগে আর খেলুম না। আড়ি।

এখন হাসি পায়। তখন কতই বা বয়স ছিল। সে সময় বউ বউ খেলতাম। পাটকাটি আম কলাপাতা দিয়ে ঘর বানাতাম। মাটি দিয়ে সন্দেশ। রসগোল্লা তৈরী করে বিক্রী করা হত। জরিনা আগমনী দিদিদের কাপড়ে গিন্নীবান্নী সেজে ওসব জিনিস কিনতো। তখন কেন জানি না জরিনার সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল বেশী। সুন্দর দেখতে। আরো অনেক কারণ ছিল—জরিনার বাবা মাঝে মাঝেই আমাদের মাছ, ডিম, শাক-সবজি দিয়ে বদলে মার কাছ থেকে মুড়ি নিয়ে যেত।

জরিনার মা নাকি মুড়ি ভাজতে পারতো না। তাছাড়া ওদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা আগমনী সহ্য করতে পারতো না। বস্তুত আমরা তিনজনেই সমবয়সী ছিলাম। বোধাহয় জরিনা কিছু ছোট ছিল।

এখন জরিনা কোথায় কে জানে। নিশ্চই বিয়ে হয়ে গেছে। বুঝি বা পলাশডাঙা গ্রামে ঘর-গৃহস্থালী নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেমেয়ে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। সময় পেলে একবার খোঁজ নেব। ওদের বাড়ী থেকে কেউ যদি আসে তাহলে ভাল হয়—কি জানি দিনকাল কেমন!

আগমনী রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়েছিল—সে সংবাদ আগেই জানি। এবার কেউ কিছু বলবে না। ওর জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওখানে থাকতে একবারও মনে হয়নি। শুনেছিলাম—দুঃখ—কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একটা অবাঙালীর হাত ধরে চলে গেছে বাংলার বাইরে। আহারে! সুন্দর মেয়েটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

অভিশাপ। দেশ ভাগের অভিশাপ। কি দোষ করেছিল। কি পাপ করেছিল। জরিনার মত সংসারের একজন হতে পারতো। কালো হাতের ইঙ্গিতে একজন পেল সুখ আর একজন পেল দুঃখ। অথচ দু'জনেই মানুষ। এই খোলামেলায় লালিত-পালিত হয়েছে এবং তাদের প্রেমিক বেকার। থাকন খাওনোর ঠিক-ঠিকানা নেই। তীরবিদ্ধ হরে মাঠ—প্রান্তর, ঘর-বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজছে সুখ। এই সব আপনপ্রিয় গাছগাছালি, পাখাপাখালি, খালবিল, রাস্তাঘাট, হিজল বন। এখন আর আপন নয়। এখানে আমি রবাহূত অতিথি।

চারিদিকে তাকালে কান্না পায়। কি জমজমাট বাড়ীঘর ছিল। এখন শ্মশান। বাড়ীগুলি আগাছা জংলায় ভরে গেছে। একদিন যে জনপদ ছিল—তার কোন চিহ্ন নেই নেই। বাতাসে হিস হিস শব্দ।

শান্তিদের বাড়ীর দুয়ারে পাট বুনেছে। ইস বিলাতি গাব গাছটা কেটে ফেলেছে। আহা! কি সুস্বাদু ছিল। রব—উঠেছে—কালু শেখ এই বাড়ী দখল নেবে। দলবল নিয়ে এলেই হল। ন্যায়—অন্যায়—বলার তো কেউ নেই। জরিনার বাবার কথা মনে হল। সে নিশ্চয় বেঁচে নেই। থাকলে কি এই আঁদাড় পাঁদাড়ের সৃষ্টি হত।

জরিনার খবর নিতে গিয়ে এমনভাবে আঘাত পাব ভাবিনি। জরিনা আগুনে পুড়ে মারা গেছে। আহা! কি করে সর্বনাশ ঘটল। এখনো চোখের সামনে ভাসছে। এখনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি —। তাড়াতাড়ি খাইয়া ল—পরে আর পাবি না। যখনি কিছু আনতো—এই কথা বলতো। আর সতর্ক প্রহরীর মতো চারিদিকে চোখ ঘোরাত। ওকি বুঝতে পেরেছিল! গেল বারে ইদ্রিস মিঞা গ্রামের প্রেসিডেণ্ট ছিল। বাড়ীগুলি নিস্তব্ধ। হাটবাজার বন্ধ! চারপাশে আতঙ্ক। তখন ইদ্রিস মিঞা জানিয়েছিল—গুণ্ডামি করলে আস্ত রাখবে না। রাতের পর রাত বিশ্বাসী লোকেদের নিয়ে পাহারা দিয়েছিল। পৈশাচিক কাণ্ড ঘটুক তা চায়নি। হতেও দেয়নি। কিন্তু নিজের ঘরেই বিপদ এসে গেল। এবং রাত্রে বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল। কেমনভাবে লাগল কেউ বলতে পারল না। অনেকের সন্দেহ গুণ্ডারা লাগিয়েছে নিজের কাজ হাসিল করার জন্য। কেননা ওদের জানা ছিল জরিনার বাবা বেঁচে থাকলে কিছু করতে পারবে না। বস্তুত কপালের লিখন অন্য। জরিনা মারা গেল। আহা! দুধের মত মেয়ে। এই

সাংঘাতিক শোকেও ভেঙে পড়ে নি প্রেসিডেণ্ট।

নিজের মহৎ কর্তব্যের কথা ভোলেননি। নরপিশাচদের কাছে মাথা নত করেননি। জরিনাকে বিসর্জন দিয়ে শত শত মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করলেন। এখন অন্ধ—বধির! বিছানায় শয্যাগত। প্রয়োজনের কাল শেষ হয়ে গেছে। আগমনী জরিনা সব গেল। বুকের মধ্যে দগদগে ঘা। কিছুই ভাল লাগে না। কি যেন নেই—কি যেন নেই। দিন যতই এগিয়ে আসছে মা বোবা হয়ে যাচ্ছেন। এবারেও যাবেন না। ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না। পাসপোর্ট ভিসা না থাকলে সীমানা ডিঙানো যায় না।

কয়েক দিনের জন্য এসে মন আরও খারাপ লাগছে। কান্না পায়। বুকের মধ্যে—অসহ্য যন্ত্রণা। হাত পা অবশ-অবশ লাগছে। মাঠে-ঘাটে অনাবৃষ্টির কাল চলছে। উঠোনে নেই শালিক-চড়ুই। আকাশে কেবল চক্রাকারে ঘুরছে চিল।

সকালবেলায় হলুদ পাখীটা ডাকছে কুটুম—আয়—কুটুম—আয়। কিছু বোঝে না ছাই। কুটুম যাচ্ছে। কুকুরটা বারান্দায় বসে ল্যাজ নাড়ছে। আমি জানি নৌকায় উঠলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মা উঠোনে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

আত্মীয়-স্বজনদের চোখে অনবরত দরদর করে জল পড়ছে। চারিদিকে একটা গুমোট গরম ভাব। কালবৈশাখীর পূর্ব মুহূর্ত। হরিলাল এসেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, আমাগো ফ্যালাইয়া কই যাইবেন কর্তা।

হরিলালের কান্নায় চোখের জল রাখতে পারলাম না। হু হু করে কেঁদে ফেললাম। কতদিন যে এভাবে কাঁদিনি। আমার মা। মা—জননী। সব যেন ঝাপসা হয়ে গেল। দেহ টলছে। কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মা মাগো।

চারিদিকে শুধু কান্না আর কান্না। ঘাটে হরিলালের নৌকাটা নেই। বাঁধন খুলে ভেসে গেছে খালের মধ্যিখানে। যেন চলে যাবার জনোই।

নতুন আফ্রিকা ও তার কবিতা

প্রবুদ্ধ সেন

মার্কিন দেশের নিগ্রো নেতা ডঃ দ্য বোয়া লিখেছেন—"The problem of the twentieth century is the colour line...." যদিও বিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাটির সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও বলা যায় এ বর্ণসমস্যাটি নেহাতই বিংশ শতাব্দীর ব্যাপার নয়, যদিও বিংশ শতাব্দীতেই তার জটিলতা সবচেয়ে প্রকট। এক সময় ছিল যখন আফ্রিকা ছিল নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা। তারা যে অসভ্য ছিল তা নয়; তবে ইউরোপীয় জাতিগুলির তার সঙ্গে অপরিচয়ের সূত্রে আফ্রিকা পরিচিত হয়ে গেল 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' নামে। কিন্তু ইউরোপীয় জাতিগুলির আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের আগেও যে এই বর্ণ-সমস্যা ছিল তার নিদর্শন আমরা পাই সেক্সপীয়রের The Merchant of Veniceএ। পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থী যে মরক্কো রাজকুমার ভেনিসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর জবানীতে আমরা তখনকার আফ্রোসীয় জাতির বর্ণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় জাতির ধ্যান-ধারণা ও চেতনার পরিচয় পাই। পোর্শিয়াকে বলছেন মরক্কো রাজকুমার:

"Mislike me not for my complexion
The shadow'd livery of burnish'd sun
To whom I am a neighbour and near-bred."

'আমার বর্ণের জন্য আমাকে অপছন্দ কোরো না, সূর্যই আমাকে এই কালো পোশাকে সজ্জিত করেছে, আমি তার প্রতিবেশী পরম আত্মীয়'। রাজকুমারের বর্ণের জন্যই যে পোর্শিয়া তাকে অপছন্দ করতে পারে, সে চেতনা তাঁর মধ্যে ছিল, তাই আত্মপক্ষ সমর্থনে মরক্কো রাজকুমারের এই কৈফিয়ত। কিংবা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে Othello নাটকে ইয়াগোর সেই ঘৃণা মিশ্রিত কথাগুলি ওথেলোর বিরুদ্ধে ব্রেবেনশিওর গৃহের সামনে যখন সে জানতে পারে ডেসডিমোনা ওথেলোর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে:

"Zounds! Sir, you're robbed; for shame, put on your gown,
Your heart is burst, you have lost half your soul,
Even now, now, very now, an old black ram
Is tupping your white ewe. Arise, arise!
Awake the snorting citizens with the bell
Or else the devil will make a grandsire of you."

এখানেও কালো ওথেলোর সঙ্গে শ্বেত ডেস্‌ডিমোনার সম্পর্ককে অশালীন ভাষায় প্রকাশ করছে ইয়াগো। সেক্সপীয়ারের এ দু'টি নাটকে একদিকে পাচ্ছি আমরা কালো জাতির বর্ণচেতনা, আবার অন্যদিকে পাচ্ছি শ্বেতজাতির কালো জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু নবজাগরণের যুগে আফ্রিকা ছিল স্বাধীন। সেই স্বাধীন আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির স্বাধীন নাগরিকেরও সন্দেহ জেগেছিল নিজের গাত্রবর্ণ নিয়ে, সন্দেহ জেগেছিল স্বাধীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নাগরিকেরা তাকে কিভাবে গ্রহণ করবে। কারণ ইয়োরোপের শ্বেতজাতির বর্ণচেতনাও তার অজানা ছিল না। স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদেরই যখন চেতনা এত সংকীর্ণ তখন পরবর্তীকালের পরাধীন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে স্বাধীন শ্বেতজাতির সম্পর্ক কিরকম দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক শাসনের বন্ধনে আবদ্ধ আফ্রিকার কালো মানুষদের মনোভাব তাই আজ সকলের জানা। ইউরোপে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ইউরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েখুঁড়ে খেল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণে কালো মানুষের রক্তকে নিংড়ে তারা সোণা বানালো আর আফ্রিকাকে ঠেলে দিল প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে। অবহেলায়, অনাদরে উৎপীড়িত জাতি অসহায়তার শিকার হিসাবে আবিষ্কার করল নিজেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আফ্রিকা' কবিতায় তার একটা বীভৎস চিত্র এঁকেছেন:

"হায় ছায়াব্রতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে॥"

ইউরোপীয় জাতিগুলির এই শাসন ও শোষণ চলেছে দীর্ঘদিন ধরে, সেই সঙ্গে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শোষণ ও শোষিতের সম্পর্ক হয়েছে তিক্ত। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের ফারাক বেড়েছে আরো। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই উপ্ত ছিল তার ধ্বংস। তাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অন্ধকারের মধ্যেও আস্তে আস্তে জ্বলে উঠতে লাগল কালো আফ্রিকার স্বাতন্ত্র্যবাদ। ইউরোপীয় ধনতন্ত্রবাদের সংস্পর্শে এসে কালো আফ্রিকা যেন নিজেকে আবার খুঁজে পেল। আস্তে আস্তে আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পরাধীন আফ্রিকার মানুষেরা ইউরোপে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে নিজেদের স্বজাতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এ জাতীয়তাবাদ কিন্তু ঘৃণার থেকে জন্ম নেয় নি, জাতিবিদ্বেষ এর ভিত্তি নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ তার বৈশিষ্ট্য নয়। আধুনিক জাতি ও তার জাতীয়তাবাদের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক E. H. Carr বলছেন—"The modern nation is a historical group. It has its place and function in a wider society, and its claims cannot be denied or ignored. But they can in no circumstances be absolute, being governed by historical conditions of time and place..." জাতি যখন স্থান ও কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন "The nation is a product not merely of the past, as historians tend to assume, nor sole by of the present situation, but of the future—what people 'aspire'

to be, to have and to do." অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটা সমগ্রতা নিয়ে গড়ে উঠেছে তাই নতুন আফ্রিকার জাতীয়তাবাদ। অতীতের উৎপীড়িত আফ্রিকা থেকে বর্তমানের সংগ্রামী আফ্রিকা এবং তার থেকে ভবিষ্যতের মুক্ত আফ্রিকার ইতিহাস রচিত হচ্ছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে। কৃষ্ণ আফ্রিকা জাগছে আজ বহুদিনের স্থগিত থেকে, জেগে উঠছে এক নতুন পৃথিবী। পৃথিবীর দৃষ্টি তাই আজ সেদিকে নিবদ্ধ। সেই নতুন আফ্রিকার পরিচয় আছে সেংঘর, নেটো, ওকুরা ও অন্যান্য আফ্রিকান কবির মধ্যে।

[লিওপোল্ড সেদার সেংথর—জন্ম ১৯০৬ সালে। সেরিয়ার উপজাতিতে জন্ম তাঁর, ধর্মে ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক। শিক্ষা প্রথমে স্বদেশে সেনেগালে, তারপর বিদেশে পারিতে। ডিগ্রি নিয়েছেন পারির সোরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে। এখানেই সাক্ষাৎ হয় তাঁর অন্যান্য নিগ্রো বুদ্ধিজীবী কবিদের সঙ্গে, দেখা হয় সেজেয়ার ও দামাসের সঙ্গে। ১৯৬০ সালে সেনেগাল স্বাধীন হলে প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন তিনি। কবি হিসেবে সেংথর সুপ্রতিষ্ঠিত। গীতিকাব্যিক বৈশিষ্ট্যে ও চিত্রকল্পের স্বকীয়তায় তিনি অনন্য। রাত্রি ও চাঁদের চিত্রকল্প তাঁর কাব্যে বার বার উপস্থিত হয়। সেংথরের কাব্যে নিগ্রো জাতিচেতনা তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত ; মৃতের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব, আবার জীবিতের ওপর তার প্রভাব, শ্বেত ইউরোপের দ্বারা প্রাচীন আফ্রিকা ও তার সংস্কৃতির ধ্বংস, আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের কর্কশ কঠোরতা এবং তাদের আফ্রিকার চিন্তা-ভাবনার প্রতি দৃষ্টি ফেরানোর আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা ; আফ্রিকার নারীর উষ্ণ বিজয়িনী সৌন্দর্য—সবই সেংথরের কাব্যে রূপ পেয়েছে।]

শিল্পিনীর রাত

নারী, আমার কপোলে রাখো তোমার স্নিগ্ধ হাত দুটি
তোমার যে হাত ফারের চেয়েও নরম কোমল।
নিশীথ হাওয়ায় দোলে দীর্ঘ পামগাছ
শব্দহীন। ঘুমপাড়ানি গান ও নয়।
ছন্দোময় নৈঃশব্দ আমাদের করে আন্দোলিত।
শোনো সেই গান, শোনো সেই আমাদের কৃষ্ণ শোণিত স্পন্দন,

শোনো,
হারানো গাঁয়ের কুয়াশার মাঝে আফ্রিকার কালো নাড়ীর স্পন্দন।
এখন ক্লান্ত চন্দ্রমা ভাটার জলে পড়ে ঢলে
এখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হাসির দমকও, আর কবিরা
আদর খায় মাতৃপৃষ্ঠে মাথা রেখে।
এখন নর্তক-নর্তকীর পদ ভারী হয়ে আসে,
গায়কের জিব।
নক্ষত্রের সময় এখন, শর্বরীর সময়, যে শর্বরী
স্বপ্ন দেখে, যে শর্বরী আরামে হেলে পড়ে
এই মেঘের পাহাড়ে দুধের দীর্ঘ পোষাকে সজ্জিত হয়ে,
ভবন-শীর্ষ বিকীরণ করে নম্র আলো।
কি বলছে তারা ওই নক্ষত্র নিচয়ে এমন নিশ্চিত স্বরে ?
অন্তরে নির্বাপিত অগ্নি তিক্ত-মধুর গন্ধের অন্তরঙ্গতায়।
নারী, জ্বালো পবিত্র তৈলের দীপ, শয্যায়-শায়িত শিশুদের
বলতে দাও আদি পুরুষের কথা, যেমন করে বলতো তাদের পিতা মাতারা
শোনো এলিসার প্রাচীনদের কণ্ঠস্বর।
আমাদের মতো নির্বাসিত হয়ে তারা মরতে চায় নি,
কারণ চায় নি তারা তাদের আদিম রক্ত মরুভূতে হারিয়ে যাক,
ধূমায়িত কুটিরে কল্যাণময় আত্মার রহস্যময় আগমন
আমাকে শুনতে দাও,
তোমার বক্ষে স্থাপিত আমার মাথা জ্বলছে, যেমন
কুস্কোসের বল আগুনের মধ্যে জ্বলে,
আমাদের মৃত আত্মাদের গন্ধ আমাকে টানতে দাও
নিঃশ্বাসের সঙ্গে,
ভাবতে দাও আমাকে, তাদের জীবন্ত কণ্ঠস্বরকে
উচ্চারণ করতে দাও,
মহানিদ্রার মহান গভীরে ডুবে যাবার আগে, ডুবুরীর চেয়ে
আরও গভীরে ডুবে যাওয়ার আগে
আমাকে জানতে দাও কি করে বাঁচতে হয়।

কালো মুখটি ধরেছিলে তুমি

তোমার দুহাতে তুমি ধরেছিলে সংগ্রামীর কালো মুখ
ভাস্বর মনে হল তা প্রদোষের আশ্চর্য লগনে।
আমি দেখলুম পাহাড় থেকে তোমার আঁখি সমুদ্রে
সূর্য গেল অস্ত।
কবে আমি দেখবো আমার স্বদেশকে, কবে দেখবো
তোমার মুখের পবিত্র দিগন্ত ?
কবে আমি স্থান পাব তোমার কৃষ্ণরঙ্গীন বক্ষে ?
ওখানে, ও-ছায়ায় রয়েছে মধুময় সিদ্ধান্তের নীড়।
দেখবো আমি অন্য আকাশ, অন্য আঁখি পল্লবও
অন্য ওষ্ঠের উৎস থেকে পান করব নেবুর থেকেও
তরতাজা কিছু,
অন্য কুন্তলছায়ায় নিদ্রা যাব আমি
ঝঞ্ঝা থেকে প্রতিরুদ্ধ হয়ে।
কিন্তু প্রতিটি বছর বসন্তের সমাগমে ধমনীতে যবে
রক্ত হবে উজ্জীবিত
আমার স্বদেশের কথা নতুন করে মনে পড়বে আমার
মনে পড়বে তোমার আঁখির ধারা বর্ষণে ধোয়া
তৃষিত তৃণভূমিকে।

[অগস্টিনো নেটো—জন্ম ১৯২২ সালে এঙ্গোলায়। পর্তুগালের লিসবন থেকে চিকিৎসা বিদ্যার ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফেরেন। ভিরিয়াতো দা ক্রুজের সঙ্গে এঙ্গোলার স্বদেশী সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে Angolan Liberation Movement (M PL A)-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই পর্তুগীজ সরকারের হাতে বন্দী হয়ে লিসবনে নীত হন; কিন্তু সেখান থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের সাহায্যে তিনি পলায়ন করতে সমর্থ হন। বর্তমানে তিনি এঙ্গোলার গৃহযুদ্ধে পর্তুগীজ ও মার্কিন সাহায্যপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। কবি হিসেবে অগস্টিনো নেটো স্বনামখ্যাত—মানুষের সপক্ষের কবি তিনি।]

বিদায় বেলায়

মা আমার
(আঃ সন্তানহারা কালো মায়েরা)
তুমি আমাকে শিখিয়েছ করতে প্রতীক্ষা, করতে আশা
যেমন দুঃসময়ের দিনগুলিতে তুমি নিজে করেছ প্রতীক্ষা

কিন্তু আমার মধ্যে
জীবন সেই রহস্যময় আশাকে টুঁটি টিপে মেরেছে

আমি আর প্রতীক্ষা করতে পারি না
আজ আমিই প্রতীক্ষিত
আমরাই তো আশা
তোমার সন্তানেরা
গতি আমাদের এমন এক বিশ্বাসের দিকে
যা জীবনকে করে উজ্জীবিত

আমরা সাঞ্জলা বনের নগ্ন সন্তান
শিক্ষাহীন ছোকরা যারা ছেঁড়া ন্যাকড়ার বল দিয়ে খেলে
মধ্যদিনের প্রান্তরে
আমরা নিজেরাই
আমাদের জীবন দগ্ধ করে ভাড়া খাটি কফি ক্ষেতে
অজ্ঞান কালো মানুষগুলি
যারা সাদা জাতিকে সম্মান দেখাতে বাধ্য
যারা ধনীকে করে ভয়
আমরা তোমার স্বদেশী সন্তান
যে স্বদেশ বৈদ্যুতিক আলোর ছোঁয়া পায় নি কখনো
যেখানে মানুষ মরে মাতাল হয়ে
পরিত্যক্ত হয়ে মৃত্যু-ডঙ্কার ছন্দের মধ্যে

তোমার সন্তান
যারা ক্ষুধার্ত
যারা তৃষিত
যারা তোমাকে মা বলতে শরমে যায় মরে
যারা পথ পার হতে ভীত হয়ে পড়ে
যারা মানুষের ভয়ে ভীত

আমরাই তো তারা
জীবনের আশা যাদের মধ্যে পুণর্জাগরিত।

———

[গাব্রিয়েল ওকুরা—জন্ম ১৯২১ সালে নাইজিরিয়ায়। শিক্ষা সরকারী কলেজে উমুয়াহিয়াতে। কর্মজীবন সুরু করেন বই বাঁধানোর কাজ দিয়ে। নাটক ও উপন্যাসও লিখেছেন কয়েকটি। কিন্তু কবি হিসেবেই তাঁর নাম—কল্পনাপ্রবণ এবং চিন্তাশীল কবি। একটা রহস্যময় কাব্যিক সুষমা জড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায়—সে সুষমা অবয়ব পায় তাঁর ভাষার মাধ্যমে তবু যেন তা ধরাছোঁয়ার অতীত কিছু বলে মনে হয়।]

তুষারকণা ধীরে নেমে আসে

ক্রন্দসীর কুয়াশাঘন আঁখি হতে
ভাসমান তুষারকণা ধীরে ধীরে নামে
আলতো হয়ে নামে তারা
শীত-ক্লান্ত এলুমের 'পরে। পত্রশূন্য,
নগ্ন শাখাগুলি ভারহীন তুষারের ভারে
নত হয় শোকাকুল মানুষের মতো
মৃত্যুহীন ধরিত্রীর 'পরে
শুভ্রবস্ত্র সম ছড়াইয়া পড়ে তারা
আর নিথর নিদ্রা চুঁপসারে উঠে আসে
আতপ্ত শরীর হতে, আঁখি মোর
মুদে আসে বারিতে পতনশীল রেশমী বস্ত্রের
স্পর্শের মতো।

তখন গভীর ঘুমের মধ্যে
এক স্বপ্ন দেখি আমি।
মুমূর্ষু পৃথিবীর স্বপ্ন সে নয়, স্বপ্ন নয়
এলুমের অতন্দ্র প্রহরার। স্বপ্ন দেখি আমি
কৃষ্ণ বিহঙ্গের, অন্তরে আমার পাখা ঝাপটায়
সে কৃষ্ণ বিহঙ্গ, নীড় বাঁধে, নারিকেল কুঞ্জে সন্তানের জন্ম দেয়
ফসলের তরে সূর্যকে বহন করে সে, মূল তার বিনাশকের
শাবলে টোল খাওয়ায়। আর স্বপ্নে দেখি আমি
বিনাশকে—শান্ত ও দুর্বল, আমার মূলেতে ঠেস দিয়ে
পরিত্যক্ত মূল
আর নারিকেল তরুগুলি দেয় তারে একটি করে সূর্য উপহার

কিন্তু হাতে নিয়ে তারা মাপে উজ্জ্বল সূর্যকে
ভ্রূকুটির চিহ্ন কপোলে তাদের—হেতু তার এই
ভাস্বরতায় সূর্য তো স্বর্ণের সমান নয় কিছুতেই।

আমি জেগে উঠলাম। জেগে উঠলাম
নিঃশব্দ তুষারপাতের মাঝে
ন্যুব্জপৃষ্ঠ এলম তরুগুলি অবনত
শীতের হাওয়ায় আন্দোলিত তারা
সান্ধ্যনমাজরত শ্বেতবস্ত্রধারী মুসলমান যেন।
আর দুর্জ্ঞেয় পৃথিবী বেদীতে আসীন ঈশ্বরের মূর্তির মতো স্থির।

হাওয়ার প্রকৃতি

সারসেরা ফিরে আসছে এখন—
নিঃশব্দ আকাশে শুভ্র রোদ যেন।
উষ্ণদেশের খোঁজে উত্তরে গিয়েছিল তারা
নতুন বাসা বানাবার আশা নিয়ে
যখন এখানে ছিল বর্ষার সমারোহ।

আজ আমার সঙ্গে ফিরে এসেছে তারা—
হাওয়ার প্রকৃতি,
ঈশ্বরের সংযমী হাত ছাড়িয়ে তারা গিয়েছিল
উত্তরে পশ্চিমে পুবে,
স্বভাবের তাগিদে।

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়
আমি বসে আছি এই পাথুরে টিলায়
দেখছি অন্তরের আবেগে তাড়িত তাঁদের ফিরে আসা
চলে যাওয়া, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি।

আর এ আন্তর তাগিদে রক্ত মোর আন্দোলিত
তার প্রতিটি বুদ্‌বুদ্‌
আন্তর স্বভাবের সবল আহ্বান
লক্ষ লক্ষ কোষে বন্দী একটি কামনা।

হে ঈশ্বরের প্রভু আর আমি,
আমি কি শুনব না এই প্রার্থনা-ঘণ্টায়
শুনব না কি মধ্যদিনের প্রার্থনা আহ্বান,
যেহেতু আমার সারস দম্পচুল আর
কালো ত্বকে বন্দী ?

বুদ্ধদেব-কাব্যে বর্ণালী

চিত্রা দেব

আমাদের কাব্যকবিতায় বর্ণসজ্জার প্রসঙ্গে অনেকে ইংরেজী সাহিত্যের বর্ণময় মধ্যযুগের কথা স্মরণ করেছেন। সেই যুগস্মৃতি অনুপ্রাণিত কবিদের কাব্যে রঙের প্রাচুর্য ছিল সত্য কিন্তু সে ঐশ্বর্য ভারতীয় বর্ণসৌন্দর্যের প্রতিতুলনায় ম্লান। বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচেতনায় রঙের উজ্জীবন বিশেষ নেই। বর্ণস্মৃতি নয়, প্রেয়সীর রূপরচনায় রঙ ব্যবহারে তিনি আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর অনুভূতিতে প্রিয়ার চুল কখনো রাত্রির অন্ধকারের মতো, কখনো নিশীথের মেঘের মতো, কখনো ঘুমের মতো। সে চুলের রঙও বিচিত্র। কখনো কবির প্রশ্ন "কেমন সে চুলের রঙ কালো না বাদামী ?" কখনো সে চুলের অবিরাম বর্ণপ্রশস্তি।—

"আহা লাল চুল, রেশমি নরম, লাল সে চুল !"
"আহা লাল চুল, শুকনো সোনালি লাল সে চুল !"
"আহা লাল চুল, হালকা হলুদ লালচে চুল !"
"আহা লাল চুল, পাতলা আলতা লালচে চুল !"
"আহা লাল উষা ! আলতায় সোনা লাল সে চুল !" [আরশি/কঙ্কাবতী]

'কঙ্কাবতী'র অনেক পরে লেখা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'কালোচুল' কবিতাতেও দেখা যাবে কঙ্কাবতীর কালোচুলে প্রতিফলিত অন্তরবির বর্ণচ্ছটায় কবি শান্তির আশ্রয় খুঁজছেন ঃ

"কঙ্কাবতী তার কালো এলোচুল খুলে দিলো সন্ধ্যার সোনালি বারান্দায়,
স্বর্গের মায়াবী বারান্দায়,
লাল সূর্যাস্তের জানালায় ;
লাগলো আলো চুলে জাগলো উচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সবুজের,
বিলোল হলুদ আগুনে বেগনির বিশ্রাম।
উষ্ণ বাদামীর হৃদয়ে ধূসরের শান্তি
রঙিন অঙ্গনে আঁধার সন্ধ্যার শান্তি।

আর্দ্র উজ্জ্বল ধারালো ছলো ছলো ভাদ্রের হলুদে বারান্দায়
কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো।"

কঙ্কাবতীর কালোচুলে সব রঙের উদ্দামতা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এলে কবি শাশ্বতী শান্তির সন্ধান পেলেন ঃ

"তবু তো পার হয়ে উত্তাল লাল আর উদ্দাম হলুদের বন্যা
কখন তুমি এলে কঙ্কা!
সিন্দুর-আলতার হলদে-লালে জ্বলে গলে যাক সন্ধ্যা
রাত্রি তুমি নিলে কঙ্কা!
তোমার কালো চুল ছড়ায়ে দিলে দূরে নীল দিগন্তের প্রান্তে,
মস্ত বিপ্লবী অপলাপ পার হয়ে দাঁড়ালো শাশ্বতী শান্তি;"

অবশেষে,

"হলদে আগুনের রঙ্গ থেমে গেলো বেগনি-বাদামির
অলীক অঙ্গনে; রঙের রঙ্গের রঙ্গমঞ্চের পঞ্চ অঙ্ক
হঠাৎ হলো শেষ;.....
আকাশ ডুবে গেলো কালোর বন্যায়
তোমার নীল কালো চুলের বন্যায় কঙ্কা! কঙ্কা!"

কবিতার নাম 'কালোচুল' কিন্তু সমস্ত কবিতাটি রঙের বন্যায় প্লাবিত। কবির কাব্যপ্রেরণা কঙ্কার রূপ ধরে সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে চাইছে। কালোর নিভাস পটে সব রঙ হারিয়ে যায়। এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি কাব্যিক পরিভাষা লাভ করলো বুদ্ধদেব বসুর হাতে। 'কালোচুল' তাঁর বর্ণপ্রীতির চমৎকার নিদর্শনরূপে গৃহীত হতে পারে। আর একটি কবিতায় রঙের ব্যবহার প্রেয়সীর সর্বাবয়বে—

"মেশা উষ্ণ তুষার তব লাল কপোলে
মাখা সুর্মা তোমার চোখের কোলে,
শাদা গলায় তোমার সাদা মুক্তা দোলে,
ঘন নীলাম্বরি
সাদা শরীর ছেয়ে।" [আমন্ত্রণ-রমাকে। কঙ্কাবতী]

ঠিক একরকম নয় তবু যেন কাছাকাছি ঃ

"Her cheeks are like the blushing cloud
That beautifies Aurora's face,

Or like the silver crimson shroud
That phoebu's smiling looks doth grace ;....
With orient pearl, with ruby red
With murble white, with sapphire blue
Her body everyway is fed,
Yet soft in touch and sweet in view :
Heigh ho fair Rosalin!" [T. Lodge : Rosaline]

উদ্ধৃতির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে অথচ কোন কবির কাব্যে বর্ণসমাবেশ লক্ষ্য করতে তাঁর কাব্যকাননে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিতে নারীর সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের যোগ নিবিড়। 'রবিবারের বিকেল'-এ তিনি দেখতে পান ঃ

"গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তিনটি তরুণী
রোদের পৌরুষে ঢেলে লাল নীল হলদে বেগুনি
মেয়েলি রঙের ছটা—"

হয়তো তাই মেয়েলি রূপে বর্ণের ছটা বেশি। শ্যামলীমুখে কালো চোখের গভীরতা নতুন রঙ পেয়েছে কবির হাতে ঃ

"তোমার মুখের রং হয়েছে বৃষ্টির পরে বৃষ্টি ভেজা গাছের পাতার মতো,
আর বৃষ্টি ভরা মেঘের গম্ভীর নীলিমা নেমেছে তোমার চোখে।"

বুদ্ধদেব বসুর প্রেমচেতনায় ও প্রেয়সীর রূপাবয়বে রঙের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য গুরুত্বলাভ করলেও তাঁর বর্ণচারিতা এখানেই শেষ নয়। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখা প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে তিনি রঙকে ছুঁয়ে-ছেনে নানাভাবে অস্বাদন করতে চেয়েছেন। তাই কিছু কিছু প্রকৃতি চিত্রে বর্ণময়ুখের ইন্দ্রজালচ্ছটা লক্ষ্য করি। [ক্রমশঃ

কবিরুল ইসলাম

কবির সঙ্গে কবিতা-সমালোচকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকাটা সুবিধাকর ও অসুবিধাকর দুইই হতে পারে। সুবিধা এই কারণে—যে ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, ভালোলাগা-মন্দলাগা, কৌতূহল-অনীহা ইত্যাদি সচরাচর ঘটে যাওয়া জিনিসগুলির সঙ্গে কবির কি রকম সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে।

কবিরুল ইসলামের কবিতার বই পড়তে পড়তে আমার এই কথা মনে পড়ল।

এ পর্যন্ত (১৯৭৮ এর জানুয়ারী) কবিরুল ইসলামের তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বহু নামী-অনামী পত্র-পত্রিকায় ইতস্তত বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'কুশল সংলাপ'—১৯৬৭ সালের জুন মাসে প্রকাশিত। কবিরুল ইসলামের পরিণত বয়সের ফসল। যদিও, দীর্ঘকাল ধরেই তিনি কবিতা লিখে আসছেন তবুও একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ ছাপার আকারে অনেক দেরীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—'তুমি রোদ্দুরের দিকে'—১৯৭১ সালের জুন মাসে প্রকাশিত। চার বছরের ব্যবধানে। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিবাহবার্ষিকী ২০', ১৯৭৭-এর মে মাসে প্রকাশিত। তাঁর এই তৃতীয় গ্রন্থটি মূলত পূর্বোক্ত বইদুটির কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার সংকলন, এবং তার সঙ্গে ন'টি নতুন কবিতা সংযুক্ত।

স্থলজলাতীত আলোর ইন্দ্রধনু
তৃষ্ণাদীঘল আকুল দুচোখ ভ'রে
তৃষ্ণাবিকল সফল দুচোখ ভ'রে
অজানা দূরের সুরের আভাস আনে
শ্রাবণশংকা শীর্ণা নদীতে রটে। (রোজকার ছড়া, কুশল সংলাপ)

অন্ত্যমিলের ধার না ধেরেও ছড়ার মতোই ছন্দোবদ্ধ এই কবিতা। 'দুপুর এবং ভোরের আলো', মনের মত কোনো বন্ধুর ভালবাসা, 'কোথাও একটু

আনন্দ ছোঁয়া'—অথবা 'স্থলজলাতীত আলোর ইন্দ্রধনু' কিছুই এখানে আসে না এবং হাসে না। তবুও কবির "এখনো এমন স্বপ্নে সানাই শোনে।" এবং সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সূর্যের প্রেমে কান্নায় ঝরে যায়।

"তুমি জানো" এবং "অপ্রাপনীয়" কবিতা দুটির প্রথম লাইনের মিল লক্ষ্যণীয়। বস্তুত দুটিতে বলবার বিষয় বস্তুও এক, অন্তত স্থূল দৃষ্টিতে। মিথ্যে-আশায় জর্জরিত প্রাণ মুক্তির জন্য ব্যাকুল। 'তুমি জানো'তে 'ব্যথার আরতি অহরহ দুর্বহ যে' এবং অপ্রাপনীয়তে 'রাজার ভূমিকা ক্রমে দুর্বহ কি যে'—প্রকৃত পক্ষে কবির একই মানসিকতায় রচিত।

"নিত্যই নতুন হই" কবির একটি অপরূপ রচনা। এই কবিতায় তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস আত্মনিবেদনের চরমপর্যায়ে উন্নীত। অবশ্য, প্রায় সব কবিতাতেই কবির ঈশ্বরবিশ্বাস সোচ্চারিত, কিন্তু, ঈশ্বরের মহিমাকে এমন সুন্দর ও সাবলীলভাবে অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি, কবি তাঁর খুব কম কবিতাতেই করেছেন। অন্তরে ঈশ্বরের স্থায়ী আসন যখন উপলব্ধি করা যায়, একমাত্র তখনই, পৃথিবীকে বড় প্রিয় মনে হয়। ঠিক এইরকম ঐকান্তিক ঈশ্বরমুখী ভাবনা পাই "জলে পাপ ধুয়ে দাও" কবিতায়। ছোট্ট কবিতা, একটি নিটোল মুক্তোর মত। ঈশ্বরের মুখ জলে জ্বলে। তাই জল সর্বপাপহারী। ঈশ্বরই তাঁর সর্বশেষ উপলব্ধি—কেননা, কবিতাপাঠও তিনি করেন এই বিশ্বাসে যে, "বস্তুত কবিতাপাঠ ঈশ্বরেরই স্তব।"

সত্য, বিশ্বাস, প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আনন্দ, আলো, এই সকল বিশেষ্য পদগুলি বিংশ শতাব্দীর জীবন থেকে ক্রমশঃ অপসৃয়মান। এই কবির কবিতায় তাই তারা সবচেয়ে উজ্জ্বল স্থান দখল করে আছে। যেন প্রাণপণে তিনি আঁকড়ে ধরে রাখতে চান এই সকল মূল্যবোধগুলিকে। এদের অভাবে যে সর্বনাশ মানুষের জীবনকে পশুর জীবনে পরিণত করবে তারই আশংকা তাঁকে ম্রিয়মান রাখে সর্বদা। সর্বদা তাই তিনি সূর্যমুখী ফুলের মতন—সত্যরূপ সূর্য, আনন্দরূপ সূর্য, ভালবাসারূপ সূর্য, বিশ্বাস রূপ সূর্য, শ্রদ্ধারূপ সূর্য প্রভৃতির দিকে তাঁর তৃষ্ণাকাতর দৃষ্টি মেলে ধরেন। তাঁর জীবনবৃক্ষে সর্বদাই সূর্য অভিসার। বস্তুতঃ কবিতায় একাধিক স্থানে তিনি এই সকল বোধগুলিকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই তাঁর অনেক কবিতার নায়ক সূর্য।

মানুষের ভালবাসা ও আসক্তায় কবিরুল যে কি নিবিড় বিশ্বাসী,

মানুষের মনে ঠাঁই পাবার জন্যে তাঁর যে কি কৃতজ্ঞতা তার পরিচয় একটি অনবদ্য কবিতায় তা স্বয়ং প্রকাশ ঃ 'যেদিন কয়েকটি চিঠি।'

'কবি মাত্রেই দার্শনিক'—এই উক্তির যাথার্থ্য পাই কবিরুলের অনেক কবিতায়। 'সম্মুখে দর্পণ' এ নিজের মুখ চিনতে পারার যে করুণ চিত্রটি এঁকেছেন তা স্মরণীয়।

সর্বত্র দর্পণ পাতা আছে ঃ
সে দর্পণে কেউ মজে। মজা দেখতে কেউ
অন্ধকার বেগবতী জলে
অসহিষ্ণু প্রতিদ্বন্দ্বের মাতে।

ছন্দের মহিমা যদি একেবারেই বিস্মৃত হই, যদি কবির নিজে হাতে দেওয়া যতিচিহ্ন মেনে তাঁর 'দুপুর সম্প্রতি' কবিতাটি একটি গদ্য রচনা মনে করে পড়ে যাই ক্ষতি কি? কবির বলবার বিষয়বস্তু কিছুই ক্ষীণ হয় না। ছন্দে নয় শুধুমাত্র শব্দ চয়নের গুণে একটি কঠিন গদ্য একটি কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

আরো একবার প্রীতির পর্যায়ে ফিরে আসা যাক। কুশল সংলাপের কবি শুধু সকলের কুশল জিজ্ঞাসাই করেন না। তিনি স্মৃতিমানও। তাঁর কামনা-বাসনা, তাঁর প্রতিবেশীর কামনাবাসনার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। তাই, এই বাংলা দেশে, যদি একহাজার বছর পরেও স্বর্ণযুগ আসে, তবুও তিনি সেদিন ফিরে আসতে চান এই স্বদেশে। তিনি তাঁর সকল স্ববাসীর মতোই চোখের তারায় স্বর্ণ নিয়েই বেঁচে আছেন। সেদিন, তাই প্রত্যাশিত আনন্দের দিনে, রক্তের নিয়মে তাঁর প্রতিবেশীকে চিনতে কোনো অসুবিধা হবে না। হতে পারে, এই কবিতায় (আমি ঠিক চিনে নেব) জীবনানন্দের ছোঁয়া আছে তথাপি বলি তাঁর এই কামনা ঐকান্তিক।

।। তুমি রোদ্দুরের দিকে ।।

এই বইয়ের দুটি অংশ। এক অংশে ব্যক্তিগত ও স্বদেশগত রচনা। অন্য অংশে বাংলাদেশের কবিতা। স্মরণীয়, এ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৯৭১। তার কিছুদিন আগে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে লক্ষাধিক মানুষের রক্তক্ষরণে। তার সুতীব্র অনুভূতি কবির মধ্যে প্রবহমান। তারই ফসল এ বইয়ের শেষাংশ।

এ বইয়ে প্রথমাংশে কয়েকটি অনুভূতিগ্রাহ্য কবিতা আছে যার আবেদন

হৃদয়ের কাছে, মস্তিষ্কের কাছে নয়। ব্যক্তিগত সে অনুভূতিগুলি রচনার গুণে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। 'আমার বাবার জন্য', 'সঞ্জয়দার জন্য', 'প্রিয়জন চলে যায়,' 'তুমি চলে গেলে তাই', 'এইখানে আমার জয়' সবই বিয়োগ ব্যথার কবিতা। কিন্তু মৃত্যুই কি প্রধান? মরণোত্তর বাক্যগুলিই কবিতা হয়ে ওঠে।

সব শেষ হয়ে গেলে তবু তার সবই থেকে যায়
আকাশে হাওয়ায়
আমাদের মনস্তাপে স্তবে
শুশ্রূষার তাণ্ডবে
সবই থাকে মাটির মায়ায় (আমার বাবার জন্য)

দর্শনের কথার প্রতিধ্বনি। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। অমোঘ, অলঙ্ঘনীয় এই পিতৃহীন মানুষের অভিব্যক্তি। এইখানে কবিরুল ইসলামের কয়েকটি উপমার কথা লিখি ঃ

পাইনগাছের মত অবকাশে (তুমি চলে গেলে তাই)
আমার ঘরের মধ্যে যেটুকু উঠান
উঠানের মধ্যে যা বাগান
তুমি তার সবটুকু জুড়ে
রোদ্দুরে রোদ্দুরে
তোমারই সমান। [বাগান ঃ (তুমি রোদ্দুরের দিকে) এবং
উপমা ঃ (বিবাহ বার্ষিকী ২০)]

রবীন্দ্রসংগীত শুনে তাই যেন মুহূর্তে আমার
অন্ধকারও রম্য হয়ে যায়
যেন জ্বর ছেড়ে গেছে
সময়ের অসুস্থ প্রহার আর নেই। (নীলিমাদির গান শুনে)

'আমার ক্ষুধার অন্নে খরা'—মানবিক আকৃতির উজ্জ্বল লাইন।

'যেদিকে তাকান বন্ধুদ্বার/কে বলে পৃথিবী পান্থশালা?
যেদিকে তাকান অন্ধকার/আমার তৃষ্ণার জলে জ্বালা।'

মুখে মুখে ফিরবার মত পংক্তি।

'সিউড়ী পেরিয়ে' (বিবাহবার্ষিকী ২০তেও সংযোজিত) কবিতায় যে ছবি আঁকা আছে তা শহরবাসীমাত্রেই অনুধাবন করবেন। শান্তিনিকেতনের

বাস ছেড়ে যাওয়ার লাইন ও দৃশ্যটি এমন নাটকীয় ও মন খারাপ করা যে গোটা কবিতাটি এক অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। 'তুমি ফিরে নিজেকে বানাও' কবিতাটি অপরিণত। এমন ডাইরেকটিভ বাক্যাবলী যে কবিতায় কত অচল তা এটি পড়লে বোঝা যায়। 'শেষ যুদ্ধ' আসন্ন চল্লিশের ভয়, প্রত্যেক মানুষের ভয়।

'তুমি বাঁশ পাতার মতো', 'তুমি ছন্দের গায়ত্রী হবে', 'তুমি ভেঙে ভেঙে' এবং 'আড়াল' একই গোত্রের কবিতা। তার মধ্যে 'আড়াল' সর্বাপেক্ষা রসোত্তীর্ণ। দূরবীণের আড়াল, আয়নার আড়াল, কথার ঠাসের আশ্রয়ের আড়াল—মানুষকে যে সম্পূর্ণ প্রকাশ করে না, তা প্রচ্ছন্ন শব্দ ও বাক্য চয়নের কারুকার্যের আড়ালে প্রকাশ করেছেন কবি।

তোমার সন্তানে আর সফল সংসারে
তোমাকে স্বয়ংপূর্ণ দেখে হিংসা হয়।
এই যে দেয়াল তুমি গেঁথে তোলো
দিনে দিনে
যেখানে আমার কোনো প্রবেশাধিকার নেই,
মাত্র আমি দূরের দর্শক। (তোমার ভোরের জন্যে)

এই সরল সাংসারিক ছবিটি ও তার অনুভূতিটি একটি কবিতার বিষয় বটে। আর সেই বিষয়টি অনির্বচনীয় হয় যখন তিনি মেনে নেন 'তোমার অশেষ মুখে আকাশে হঠাৎ জ্বলে ধ্রুবতারা।' 'হাজার দুয়ারি' কবিতাটি আমার কাছে উল্টো মানে এনে দিল। আমি জানতাম একটাই দরজা আছে ঢুকবার আর বেরোবার জন্যে আছে হাজারটা। কিন্তু কবি বললেন, 'একটাই দুয়ার আছে বেরোবার/কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্যে/হাজার দুয়ার খুলে ধরো' ভেবে দেখলাম, এই কথাটাই ঠিক। সর্বশেষ কবিতা, 'বিবাহ কেবল নয় বিবাহবার্ষিকী' অনন্য সাধারণ রচনা। কুড়ি কুড়ি বছরেরও পারে (জীবনানন্দ মনে পড়ে নাকি?) উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। প্রবতারা দেখা যায়। ভার এবং সম্ভার দুই-ই অনুপস্থিত থাকে। প্রতিমা হয়ে ওঠে বয়স-বিজয়ী। রূপ নয় প্রাণই প্রতিষ্ঠা পায় বিবাহের বাস্তব অর্থে। এই উত্তরণ কবির উত্তরণ। মানুষের শাপমোচন।

সব্যসাচী রায়চৌধুরী

সুশীল রায়

যাত্রী

প্রচুর পিপাসা নিয়ে এসেছি এ নিভৃতে বন্দরে—
কোথায় তোমার ভূমি, তোমার ঠিকানা
বার-বার জিজ্ঞাসায় উত্তর মেলে না কিছুতেই।
সাতটি সমুদ্র পার হয়ে ঢেউ কিনারে এসেই
আছড়ে পড়ে, ফেনায়িত উন্মত্ত ধ্বনিতে পূর্ণ হয় চারিধারে।

সমুদ্রশকুন কী-যে খুঁজছে তার নাম সে জানে না,
তবুও ছোবল দিচ্ছে অবিরত অক্লান্ত প্রয়াসে
যদি কেউ আসে, কেউ আসে।

আমি যেতে চাই দূর-দেশে, তার জানি না নিশানা
বিন্দুবিসর্গও যদি জানতাম সে-নাম ঠিকানা
এখনি নোঙর তুলে যে জাহাজ যাত্রায় প্রস্তুত
তা হলে হতেম যাত্রী তার। কিন্তু যে আসে, যায়
সবই এক মনে হচ্ছে। পরিবেশ এ এক অদ্ভুত।
সুতরাং আছি খাড়া। দেখে যাচ্ছি সমুদ্রশকুন
আমিও ওদেরই একজন কিনা—নেই তাও জানা।

কৃষ্ণা বসু

কার কাছে দায়বদ্ধ রয়ে গেছো জল ?

'আজ তার জন্মদিন'—সকালে শুশ্রূষা-মাখা শিশির এসে
তার কানে বলেছে এসব কথা। এই তার জন্মদিন!
তোমার কি মনে ছিল? যুযুধান রথে চড়ে রোজ রোজ
কোন যুদ্ধ জয়ে যাও? প্রাচীন গ্রন্থের থেকে কোন মুদ্রা

শিখেছ তুমি ? জীবনযাপনের কোন ভাঙ্গ তোমাকে শাসায় ?
কার কাছে দায়বদ্ধ রয়ে গেছে জল ? অতিক্রম শেখোনি সে ?
শেখোনি সজ্ঞান উত্তরণ ? মানুষ বেঁধেছে তাকে, বেঁধেছে সমাজ ঃ
লোভী জল, জলের লোলুপ জিভ উঠে আসে স্বপ্নের ভিতর
অজ্ঞানে, অসমীচিনে ; তোমার কি মনে পড়ে আজ তার জন্মদিন,
জলের শুশ্রূষা পেয়ে সে একদিন, মনে পড়ে আজ তার জন্মদিন,
সাপে-খাওয়া ছেঁড়া-ফ্যাঁড়া টুকরো শরীর তার জলের সেবায়
বেঁচেছিল ? তোমার কি মনে পড়ে আজ তার জন্মদিন
আজ কিছু নির্জন সময় রেখো হাতে।

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

হাওয়া বদল

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মাঝে মাঝে তোমার ঘুরে আসা উচিত
এই বাদামের দেশে বৃষ্টির দিন শেষ হয়ে এল এ বছরের মত
কাল তার পুরনো জ্যোৎস্না খসিয়ে নেমে গেছে শেওলা পড়া চাঁদ
লাউ-এর মতন তার স্বচ্ছ খোলস জড়ানো ধুঁধুল গাছের মাথায়
বাবুই-এর বাসার মত ঝুলছে অজস্র ধুঁধুল আদিবাসী শিকারী শিশুরা
ছোট ছোট তীর-ধনুক হাতে ঘুরছে শালের জঙ্গলে
নির্জন কোটরে ভালুক ছানার নরম ঘুমে সারারাত
ঝর্ণার শব্দ নামছে দূরে

মাঝে মাঝে এমন হাওয়া বদল তোমার প্রয়োজন দীর্ঘ অবসর
ভ্রমণ প্রয়োজন তোমার, মাথায় শোলার টুপী তুমি ঘুরে বেড়াও
হাতে বন্দুক, বুট জুতো আর তোমার অসুখ নেমে যাচ্ছে, শীত
খুব জাঁকিয়ে পড়বে এবার—এমনি সব সুখ
তোমাকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত বালাপোষের মত
ঠিক যেমনটি তোমার ঠাকুর্দা
একবার চেঞ্জে এসেছিলেন এখানে বৃষ্টির দিন
শেষ হয়ে এল এ বছরের মত তুমিও বেরিয়ে পড়েছো
সুস্বাদু লাল কাঁকড়ার সন্ধানে
আর একটা তকতকে নতুন সাইকেল কেনার কথা ভাবছ এখন

অভীষ্ট

দোদুল্যমান আত্মগত কোণ থেকে বেরিয়ে এলে
দেখতে পাই সেই সত্তাটাকে—
যে শক্ত হাতে লাগাম ধরে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে
ছুটতে ছুটতে বইয়ে দেবে
এক ঐতিহাসিক ঝড় আর রক্তকে ;
ঘোড়ার খুরে বন্ধুর পথ ক্ষত-বিক্ষত করে
যাতে রয়েছে পারত পক্ষে—
উজানে ঠেলে যাওয়ার সোদর্প শক্তি
আর দুরন্ত আক্রমণের টগবগে উন্মাদনা ;

আজ যারা জীর্ণ নদীটার পাড়ে পোড়-খাওয়া
কাল তারাই আনবে প্রচণ্ড ধ্বংসের সমুদ্র-কল্লোল
বিবস্ত্র দুঃখের হাতিয়ার নিয়ে আজ তারা
শিখে গেছে কিভাবে দাঁড়াতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে !

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

অরণ্যের কবিতা

মানুষের খুব কাছে এসে গেছে বন
সাজানো ঘরের পাশে পশুদের ঘ্রাণ ;
লোকালয় থেকে ছিল অরণ্য সুদূর
পরস্পর দেখে নেয় পশু ও মানুষ
কে কাকে চিনে নেবে আপন স্বভাবে
নিভন্ত আগুন পোড়ে জ্বলার আশায়
মানব-জন্তুর দাঁত বসায় কামড়
রক্তক্ষরণের নুন ঢেকেছে শরীর
মানুষ পশুর জন্য পেতে রাখে ফাঁদ
নিজে ধরা পড়ে জালে নিজের কৌশলে

সাক্ষী থেকে যায় রাতে আকাশের চাঁদ ।।

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

আলো

হৃদয়টাকে আকাশ করে দ্যাখো
ওখানে আসল জীবন খুঁজে পাবে।
নতুন পৃথিবী হবে আলোময়।
দুঃখ, সুখ, অন্ধকার সবই তো ক্ষণিক
এদের দহন মিথ্যে, সে কথাটা বোঝো।
এবং আকাশ হও, নিজের মর্মার্থ খুঁজে নাও।

নিজেকে নির্বাধ নীল অফুরন্ত আকাশে ছড়িয়ে
মানুষের সত্যে হও আলো।

কবিরুল ইসলাম

যাবো

তোমার বন্ধুতা পেলে এক হাজার মাইল হেঁটে যেতে পারি
কেন তুমি মুষ্টি ভিক্ষা আমাকে দেবে না ?
দিলেও, তোমার যেমন আছে, যেখানে যেমন
স-ব থেকে যাবে
বরং বিদ্যার মতো যাবে বেড়ে, যে রকম বাড়ে
ফুল থেকে অগোচরে ফলের গড়ন

তোমার প্রশ্রয় পেলে এক হাজার মাইল হেঁটে যাবো ॥

আনওয়ার আহমদ

এখনও

এখনও তোমার সাথে
সাত লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত
সতেরো দিন ও রাত্রি
প্রেম করে যেতে পারি আমি

সুপ্রিয়া, একদা ষোড়শী তুমি
এখন জননী, আমার গৃহলক্ষ্মী
এখনও তোমার সাথে সাত লক্ষ
তেত্রিশ হাজার পাঁচশত
সতের দিন ও রাত্রি
প্রেম করে যেতে পারি আমি

কাজী আমিনউদ্দিন আহমদ

কেউ মুঠো বন্ধ করে

কেউ মুঠো বন্ধ করে
কেউ মেলে দেয় আকাশের বর্ণাঢ্য শাড়ী
দূরের সূর্য সাগরে
চন্দ্রের দেশে
জ্যোৎস্নায় কেউ কেউ হারায়
কেউ কেউ মলিন হয় দুঃখের সিরাপে
বুকের ভিতর তবুও স্মৃতির মত ভাসে
নীলাভ আকাশ
চঞ্চল পাখীর ঘরে ফেরার বুনো রোমান্টিকতা
এবং একসময় হৃদয়ে সবার রাত্রি নামে
একে একে নক্ষত্র জেগে ওঠে
নক্ষত্রের চোখে অনেকের চোখ ভরে যায়
দুঃখে অথবা সুখে।

নির্মল বসাক

অভিনয় নয়

তুমি কতটুকু ভালোবাস জল কতখানি অবহেলা কর
ক্ষমা প্রার্থনার মতো তৃষ্ণার হাত গণ্ডুসে এগোয়
অশ্রুপাত আছে সে জানে সূর্যই শুধু ছোঁয় অন্তর্বাস
অবহেলা তবু সয় যেহেতু হলুদ পিয়লে হাতে রঙ লাগে
মহুয়ার ফুল খেলে পার্থক্য থাকে না কোন ভ্রমরে ভ্রমণে

উদাসীন ঋষি আমাকে যা দেবে দাও যৎসামান্য জল
নিজেকে নিজেই এক রৌদ্রের দুপুর করে নিই

শুধু অভিনয় দিও না আমাকে

অখিল দত্ত

এই সময়

সব ঠিক ছিল,
ঈশান কোণে উজ্জ্বল আলো ;
দূর বনে হলুদ ফুলের হাতছানি
অপাপবিদ্ধ বালকের হাসি।
সহসা বোধকে বাঁধর করে ধ্বনি ওঠে ঃ
এই দেশ, আমার এই দেশ,
প্রাণ দেব, আরো প্রাণ।
আর তখনি সন্ত্রাস ছড়িয়ে যায়,
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।
মানুষের আক্রোশী বন্যায় ভেসে যায়
খেত-খামার ঢেঁকিশাল,
ঘুঙুরের বোল আর নীল খাম চিঠি।
পোড়মাটির গন্ধে প্রহসিত হয় দেশপ্রেম।

বীরেন সাহা

রাজসজ্জা ফেলে রাখো

প্রলোভিত পরবাসী
লক্ষ্যে স্থির হও,
কাঁটাঘেরা বিক্ষত ভূমিতে
আর থাকা নয়,
নিদাঘের মৌন ঘরে ফেরো
নিজ হাতে গড়ে তোলা আবহ প্রাসাদ
হীরে মন পোষা পাখি

মালতীর ইকেবানা মনোহর গোলাপী গালিচা
এইসব গন্ডী দিয়ে বেঁধে রাখা বৃথা।
কোলাহলে যদি বাড়ে বেলা
তবু ঈষৎ স্মৃতি বটের পাতায়
হাওয়া হয়ে ঝরে,
হৃদয়ের বুনো ঘ্রাণ বহুদূর যায়—
ধানক্ষেত পাটক্ষেত মাতিস আকাশ
অ্যাসফল্টে ধাঁধানো সড়ক
এখনো সুঠাম
পুরোনো গরুর গাড়ী
এখনো সেখানে চলে,
ঘাস ফুল
অপার্থিব স্থলপদ্ম সবুজ ফড়িং।
পরবাসী, কাঁটাঘেরা বিক্ষত ভূমিতে
রাজসজ্জা ফেলে রাখো।

প্রবীণ সরকার

বাকি-ইতিহাস

তোমার রক্তের সিরাফে বুঝি
ভাঁটার নদীর শিথিলতা
অপ্রমেয় দুরারোগ্য যৌবনের
ব্যাতিস্তম্ভে রাত্রি অবসান।
নির্লিপ্ত নিয়তি তার অট্টহাসি নিয়ে
নিয়ত বেড়ায় খুঁজে অতীতের ডানা
সেখানে আটকে আছে
প্রজন্মের শত শত আশ্চর্য ঠিকানা।

আসলে তোমারও বুঝি
এতদিনে প্রত্যাবর্তন শুরু
রক্তের গভীরে খেলে
পুনরাবৃত্তির এক আদি ইতিহাস!
নিয়তির হাতে যার নিহত সকাল
ব্যর্থতা ঢাকে কি তার বাকি-ইতিহাস?

নমিতা ভট্টাচার্য (বসু)

তুমি আছো

ঘুমভাঙা মাঝ রাতে
সমুদ্র যখন জেগে যায়
অথবা বিষণ্ণ বিকেলের
দীর্ঘায়িত গাছেদের ছায়া
হাতছানি দিয়ে ফিসফিসে
কথা কয়, তখনই, কিংবা—
জীবনের সুখ সুখ খেলার
তলা থেকে পাক দিয়ে উঠে
আসে শবদাহের গন্ধ—
বুঝি ঃ তুমি আছো
ভীষণ ভাবেই বেঁচে আছো।

সুশীল পাঁজা

অমল শব্দে ভেঙ্গে ফেলো

আমার চোখের জলে ঘুমোয় বর্ধিষ্ণু বিকেল
মাছরাঙা উড়ে গেলে পাতা ঝরে পুকুরের ওপারে
এখানের অন্ধকারে খেলে গরল তামাসা
মনের আয়নায় দেখে রামধনু ঝিরঝির
বৃষ্টির নীরবতা…

হয়তো কৃষকের মাঠে বইছে হাওয়া
খড়কুটো মলিন বেদনা
এসব গ্রামের কথা শহরের মানুষ খোঁজে
শুধুই টাটকা খবর
এভাবে জ্বলতে থাকে ভিখারীর পেট
পরিশুদ্ধ মানুষের বিবেক…
বনজ লতার দিকে তাকাও যুবক
পেয়ে যাবে মানুষের ঘাম ও শরীর
শুধু একাকী অমল শব্দে ভেঙ্গে ফেলো
বিচিত্র সংবাদ
শোষক মানুষের মন থেকে ছিনিয়ে নাও
বীভৎস ব্যবহার কৃত্রিম লাভার স্রোত…

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক অন্বেষণের পরে

আকাশ আমায় দান করেছে
নিঃশব্দের নীল
স্মৃতির আবেগ বুকে নিয়ে
খুঁজতে গেছি নক্ষত্রের দিন।
অন্ধকারে আকাশ জুড়ে হাজার হাজার
মশাল জ্বলে
রাত্রি নামে ফুলের গন্ধে
হাতটি ভরে
আমি তখন কুঠরিটাকে বন্ধ করে
দাঁড়িয়ে থাকি অনাথ সঙ্গীহীন।
পৃথিবী থেকে পাতাল
শব্দ আছে, কথা আছে,
অথবা শুধুই শব্দ।

চাঁপার বনে ঢেউ তোলা এক
বাতাস—
সমুদ্র থেমেছে নিস্তব্ধ।
শব্দ শান্ত মনের মধ্যে
শিসমহলে ভালবাসা লক্ষতারা।
হাত বাড়ালো হাত ছুঁলো না।
আকাশ এখন লক্ষ যোজন দূরে।
সন্ধ্যাপ্রাতের নিহত পরম্পরা—
আহত প্রার্থনায়
সূর্যসোনা দিন।
আকাশ কেবল ফিরিয়ে দেয়
নির্জনতার নীল।

সৈয়দ কওসর জামাল

অসুখী

এতো ভয় ছিল, ভয় ছিল কি আমারো!
চোখের ওপর বসেছিল মোমবাতির এক ছায়া,
মেঘের নীচে পাহাড়তলীর পথ, এবং মায়া
সস্নেহে ছুঁয়েছিল হাত—ভয় কি ছিল তারো?

তখন আমার অনেক বন্ধু ছিল—দুঃখ
এবং প্রেমের ঈর্ষা অনেক, অলীক সন্দেহ
টের পেয়েছি স্পর্শ দিয়ে ভাবিয়েছিল দেহ
কিন্তু তখন ভয় ছিল না, পাপ ছিল কি সূক্ষ্ম?

আমার তখন সাহস ছিল অবিশ্বাসীর মতো
হঠাৎ কেন দৃষ্টি পেয়ে চমক খেলো চোখ
শবের মতো ভাসিয়ে দিলো নিরাবরণ শোক
তুমি তখন স্মৃতির ভিতর কুয়াশা ইতঃস্তত

আমি কি আজ সুখী হবো, সুখী হবো আরো?

ভয়

পাহাড়ের শীর্ষচূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাই
কিছুই চোখে পড়ে না সামান্য ঘাস বা ঘাস ফড়িং কোন কিছু নয়
ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নিটোল পাহাড় পাথর
গাছগাছালি ফলফুল ঝরণা কিছু নেই।
এখানে আমিই একমাত্র আগন্তুক অথবা বিজেতা পাহাড়টা আমার
অন্য কোন দাবীদার নেই তবুও বলা যায় না……
আমার কাছে কোন সিন্দুক নেই পাহাড়টা যার মধ্যে পুরে
নিশ্চিন্ত হতে পারি।
এখন আমার বিশ্রামের খুব প্রয়োজন
আমি ক্লান্ত ঝড়ে ডোবা বৃষ্টিতে ভেজা শহীদ মিনারের ওপর
বসে থাকা টুনটুনি পাখির মত ক্লান্ত অবশ
আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখে থমকে যাচ্ছি।
আত্মার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি
আমি ভীত সন্ত্রস্ত আমার ভয় কেউ যদি পাহাড়টাকে
চুরি করে নিয়ে যায়
ওটা হাতছাড়া হয়ে গেলে গরুর মত অন্ধকারে নিঃসঙ্গ জাবর কাটতে হবে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কণ

আমি এখন ছবি আঁকব আমায় কেউ বিরক্ত করো না
আমি ছবি আঁকব কাগজে দেয়ালে আর সমুদ্রের বালিতে
আমার সঙ্গে কোন রং নেই, তুলি নেই, ভাঁড় নেই
আমার সঙ্গে কোন সিঁড়ি নেই, সাগরেদ নেই, কোন ছবিও নেই
মানুষ ছবি থেকেই ছবি আঁকে—আমার কোন ছবি নেই

আমি আমায় আঁকব তোমায় আঁকব
আমাদের দাঁড়ানো আর শোয়া—
বোতামের নিচে যে প্রকৃত রং লুকিয়ে আছে
বালিতে সারসের ছায়া আর কাঁকড়াদের ব্যস্ততা
আমি সিঁড়ি আঁকব, রঙের ভাঁড় আঁকব রং আঁকব
রেখাগুলো বেঁকে যাবে—তোমার বুকে হবে সমুদ্রতীরের মত নির্জন,
শূন্য
লাল লাল কাঁকড়াগুলো ফুলের মত ছড়িয়ে থাকবে
গলার পাশে

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

মাধবী, কখনো ঘুমে

ঘোর দুপুরে নামতে থাকে লতাতন্তু ঝাপসা আলো
নীল রেশম রক্তের ভেতরে অঙ্গুরীয়
সন্দীপ আইভি তোমরা যেখানেই থাকো
বেড়াতে এসো নদীর কাছাকাছি
নীল মাছি ঘুন পোকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুঁড়ো করে তক্তপোষ
সতরঞ্চির রং জ্বলে যায়,
নৌকোর খোলের নীচে মৃতদেহের গন্ধ জল ঘুরছে
সোঁতের টানে চোরাবালি জীবন জুড়ে সতরঞ্চ
পদ্মা তোর পীন স্তন ভেঙে চর জাগে
কাশফুলে দুলে যায় অপরাহ্ণ বেলা,
মহুয়ার জঙ্গল ঘেঁষে ভালুকের মতো চাঁদ
জ্যোৎস্নায় ছায়া দেখে—শীৎকার
বড়ো বড়ো শালপাতার কুলপীর মতো ক্লান্ত আলো
টুপটাপ, আমি আর মাধবী গাঢ় হয়ে রাত জাগি
অবশেষে স্নায়ুর বেহালা বাজে,
রক্ত টানে ছড়—তেজস্ক্রিয় সোনালী শরীর
মাধবী তোমার বুকে এই রাত্রি মাথা রেখে কখন ঘুমোবে !

নীল অন্ধকারে

নীল অন্ধকারে ডুবে যায় দিন
করুণ স্বপ্নের মতো পাকুড়ের হিম-ডালে
জোনাকিরা জ্বলে
যেন তার অশ্রুর ভিতর
স্মৃতিময় দুঃখগুলো ফোটে
আর সেই প্রান্তরে
গভীর হয় রাত……

তবু ঐ নদীর বুকে কথা বলে ঢেউ
আর মৌন মেঘের কোলে
ঘুমিয়ে পড়ে চাঁদ…

দীপক সরকার

চ'লে যাওয়া

শুধু চলে যাওয়া,
সেটা বড় কথা নয়
কিন্তু কিভাবে কেমন ক'রে যাবে—
খররৌদ্রে শীর্ণপাতা মরামাস কালবৃক্ষের মতন,
নাকি
হা হা শব্দে ছুটে আসা কালবোশেখীর ঝড়ে
উড়ে যাওয়া পাতার আদলে ?
প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে
বোঁটা থেকে খ'সে পড়ে পরিপক্ক সময়ের ফল,
রাত্রিশেষে ম্লান হয়
কুন্দশুভ্র বেল যুঁই অনিবার্যভাবে ।

চলে যেতে হবে—চলে যেতে হয়।
শুধু চলে যাওয়া
সেটা বড় কথা নয়
কিন্তু কিভাবে কেমন ক'রে যাবে—।

তাপস গুপ্ত

কৃষ্ণপক্ষের রাতে

কৃষ্ণপক্ষের রাতে তুমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলে
পার্থ হৃদয় নিয়ে
ছিল কি সেথা জীবনময় পবিত্র উচ্চারণ?
অরব সব কথাগুলি
একদিন আলোক হ'য়ে ঝরতো নিরাকাশের তারার ভেতর
পেয়েছ খুঁজে কি?
ভাবায় আমায়, দেখায় আমায়
প্রাচীর গাথার মত
নদী হ'য়ে খুঁজতো যেথা তরুণ চিত্রলেখা॥

বাণী বসু

আজ অবেলায়

আর ঠিকানা খুঁজো না মন—
আর ফিরে চেয়ো না—
তবুও এখন সময় নয়
এখনো অনেক অচেনা আছে, অনেক অচেনা

এক একদিন যদি সেই পুরোন-সুর
হঠাৎ হঠাৎ বাজে, মনে হয়

চলে গেছি অতি কৈশোরে কিংবা শৈশব কৈশোর
মাঝামাঝি মাথামাথি হয়ে যায় স্মৃতি

আজ অবেলায় যদি তুমি থাকো দূরে
মনে পড়ে যৌবনের সেই দিনগুলি
বকুলের গন্ধ বুকে নিয়ে হেঁটে চলা
নির্ভাবনায়—শুধু ভয় কিংবা ভালোবাসা
ধুক্‌পুক্‌ ধুক্‌পুক্‌ হৃদয় দুপুর।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

উজ্জ্বল চোখের নীচে

অইখানে স্পর্শহীন তুমি দাঁড়াও
তোমাকে ছুঁয়ে দেখবো তোমার চোখ মুখ
এবং কানের পাশে গভীর বিস্ময়ে
যে কালো তিল জেগে আছে তার রঙ
রোদের ঝিলিকে কখনো খয়েরী বাদামী
একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত বারবার আমার ছোঁয়ায়
অন্তত আমি
তোমার শরীরের সেই যতিচিহ্ন জানি অথবা তোমার
নাভিমূলে শিকারীর অস্পৃশ্য দাগ
ভালোবাসাহীন তোমার চোখের কৌতুক

অইখানে তুমি স্পর্শহীন দাঁড়াও
তোমার শরীরে ধীর অকম্পিত আনন্দ
তোমাকে ছুঁয়েই দেখি
তোমার উজ্জ্বল চোখের নীচে
মসৃণ গালে কোন তস্করের দাগ

নীরদ রায়

এইভাবে

সব কথা এইভাবে দীর্ঘপ্রতীক্ষা হয়ে যায়
নিজস্ব চমকহীন মিলনে বৃষ্টিহীন মেঘ—
ক্রমাগত ভেঙে পড়ছে রাত্রির ভূমিকায়
শব্দের আড়াল থেকে এক একটা প্রস্থান
আলুথালু ব্যথার মতো সহসা
উদ্দাম লোকালয়ে বেড়িয়ে আসে
মানুষের বিকল্প হয় মানুষের মধ্যবয়সী স্মরণ
যাবতীয় বাতিল দৃশ্যে সমস্ত যাওয়া
আশা—প্রতিশ্রুতি—স্বচ্ছন্দ অরণ্য হয়ে যায়

এইভাবে সব কথা দীর্ঘপ্রতীক্ষা—

মানিক চক্রবর্তী

সতেরই বৈশাখের ঘুম

সতেরোই বৈশাখ আর সতেরোই বৈশাখ।
বরং চায়ের দোকানে বসে
তোমার মত স্কুলের দিদিমণিকে দেখার মজা কতো।
পাতলা মোমের মত চামড়া ছিল।
তাছাড়াও ভেতরে কত অসাধারণ ব্যথা ছিল।
অগ্রিম দুটো সিনেমার টিকিট বালিশের তলায় রেখে
তোমার ঘুমন্ত আর ব্রণভরাতি মুখ
ভয়ে ভয়ে একবার মাত্র ফিরিয়েছি,
সতেরোই বৈশাখ—
যাতে কোনোরকম না জেগে ওঠো।
দিদিমণি, আমার দিদিমণি,
ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তুমি শুধু তোমার মত থাকো—

সতেরোই বৈশাখ আবার কি ?

শামসুল ইসলাম

সাকিন

'এই আছি, আর এই তো নেই'
বললে এসে যেই,
তাকিয়ে দেখি আকাশ গঙ্গা
জল এঁকেছেন চতুরঙ্গা।

তোমার স্থায়ী সাকিন অনন্তরেই ।।

অমল দেব

ব্যর্থ কবির সহধর্মিণী

বিদায়ের সন্ধিক্ষণে, বলেছিলে—
তুমি দুয়ারে দাঁড়াবে
পেছনের ফেলে আসা স্মৃতিটুকু
মুছে ফেলো কেমন ?…
বিমর্ষ হয়ো না ; প্রসন্ন চিত্তে থেকো
স্বাস্থ্য রক্ষার সকল প্রকার যত্ন নিও
নীরব থেকে ;
আপন দুঃখের কারণ আপন হৃদয়ে
লুকিয়ে রেখো না ;
আটকানো ভাবনার স্রোতকে
মোহনায় মিশিয়ে দিও।
ধর্ম ও জীবনের স্বাভাবিক স্বচ্ছতা রেখো
আর প্রহরে প্রহরে
আমারই দেয়া সুরে গান গেয়ো
সব ঠিক হয়ে যাবে… !

কিরণশংকর মৈত্র

কখনও পলাতক

আমাকে পরিপূর্ণ নিরস্ত্র কোর না,
না-হয় চুলে লেগে থাক দুয়েকটা
বনজ ফুলের পাপড়ি,
জংলা ফলের গন্ধ শরীরে—
আমাকে মঞ্চের তীক্ষ্ণ আলোয় এনো না।

না-হয় কামিজে জড়াক মেঠো ধুলোর
সৌরভ,
চম্পলে বালখিল্য পেরেকের লুকোচুরি,
আঙুলের নখে মুক্ত আকাশের রঙ,
জামার আস্তিনে কিশোর ক্রিকেট ম্যাচের
উল্লাস—
আমাকে আলোর সতর্ক বলয়ে এনো না,
আমাকে পরিপূর্ণ নিরস্ত্র কোর না।।

নীতীশ বসু

বালক তুমি আর বালক নও

বালক তুমি আর বালক নও, এখন বলিষ্ঠ যুবক।

তবু
মনের সেই সংকীর্ণ নদীর ভিতর বেঁচে থাকা
একটা বিড়াল একটা মাছের যেন দৌড় প্রতিযোগিতা
সকালের সেই স্বপ্ন দুপুরে জলের বুদ্‌বুদ্‌
তুমি এখনো এপাড়ে আসতে পারছো না,
বুকের ভিতর একটা তীব্র কণ্ট
হায় বন্দী জীবনের ভালোবাসা···

বালক তুমি আর বালক নও, এখন বলিষ্ঠ যুবক!

চিত্রভানু সরকার

অভুক্ত আত্মা

অভুক্ত আত্মাকে তুমি কি বুঝ দেবে
না কি বলবে অনাহার স্বাস্থ্যের অপকারী,
আত্মার তীক্ষ্ণ দাঁত চায় খাদ্য—রক্ত, মাংস
ও ভালবাসা।

তুমি উদাসীন হলেও নির্লিপ্ত বোধে ঠিক
পড়বে টান
শরীরের উত্তাপ ধাবমান
লালা জমে জিহ্বায়
প্রয়োজনে রক্তের ঘোড়া ছুটে আসে
কি করে লাগামে দিবে হাত।

রথীন কর

অনেক বড়ো

এখানে মোরামের লালে
হৃদয়ের রঙ ফিকে হয়ে
আসে। অথচ ফাইলের আবরণ
সরিয়ে নিলে ঘটনার হাতল
ধরে পৌঁছে যাওয়া যেতো
অনেক অস্থির সন্ধ্যায়।

মাঝে মাঝে
তোমার নিরঞ্জনে
মগ্ন হয়ে থাকা।

মরা গাঙে বান আসা
দেখিনি। দেখিনি
চাঁদে যাওয়ার মানুষী মত্ততা।
কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ডে সরব রোলার
পার্কে শিশুদের কলরব
অনুর্বর ধূসরে চেষ্টার্জিত
সবুজের যোজন,
কৃষি প্রদর্শনী
টিমটিমে রাস্তায়
হঠাৎ নিয়মের হাতছানি
বর্ণহীন সমারোহে
তোমার নিঃশব্দ প্রকাশ
অথচ তোমার আরব্ধ কাজের
জুতোজোড়া
আমাদের আয়তনে
অনেক বড়ো ।।

সমর চক্রবর্তী

কেননা জীবনে

বারবার দেখবার ইচ্ছে করি তাকে
দু'চোখ পূর্ণ ক'রে আর যেভাবে
তার অনেক বেশী ক'রে জানবার ছিলো
অর্থহীন সান্ত্বনা পেলে কী করে
পাষাণ হৃদয়

যেমন আইসক্রীমে শিশুর হতাশা
বাড়ে, বাড়ুক ক্রমশ।
কেননা জীবনে কারো তৃষ্ণা মেটে না।

ব্রজ চট্টোপাধ্যায়

বই মেলা—'৭৯

এবারও বলেছিলাম—চলো যাই বইমেলায় ;
স্বপ্নের মধ্যে কোনদিন আর ঘুম হয় না
শুধু পিয়ন ফেরে, হাতে নেই চিঠি বিলি করার,
বুকের মধ্যে সিগরেটের ধোঁয়ায়
ঘুম পাড়িয়ে রাখে এক অবুঝ অপুকে

এবারও বলেছিলাম—চলো যাই বইমেলায়,
গাছতলায় দাঁড়িয়ে ইণ্ডিয়ান কফি হাতে
কিছু ছায়া জড়ি করা আলো থাকত ঘিরে
হরিণ-শিশু ছুটে আসত মনের কাছে ;
মলাট ছিঁড়ে পাতা থেকে ছুটে আসত
সব কবিতার লাইন,
দোকানে পড়ে যেত হৈ চৈ
বই আছে, পাতা আছে—আর···
এলাম যখন একলা কিছু বই হাতে
একলা ক্লেন চলেছে তখনও মাটি কেটে।

দুর্গা চট্টোপাধ্যায়

হাততালি আমায় নয়

দাদারা দয়া করে আর হাততালি দেবেন না
এমন কিছুই করিনি এবং সে যোগ্যতাও নেই
আমি এক সাধারণ জ্ঞানপাপী হরিদাস

দয়া করে হাততালি দেবেন না দাদারা এখন
যোগ্যহীন লোককেই হাততালির রেওয়াজ বড্ড
বেমানান বরং নিন্দা কিংবা শোকে
ছড়িয়ে দিন হাসপাতাল সাদা রঙ যেহেতু

আমি ধৃষ্ট প্রবাসী অহংকারী বোহেমিয়ান
আমি আমার মাকে কাঁদিয়ে এসেছি।

মমতা রায়

অপেক্ষা

অস্ত যাওয়া প্রাণ—
পড়ে রয়েছে
এখনও বেশ কিছুটা সময়।
আবছায়ায়,
চির শান্তির সেই দূত।
মুখে হাসি
অথচ
প্রসারিত হাতে
মুহূর্তে কিছু ছিনিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায়।
বাস্তবটা যেন—
স্বপ্নেরই প্রতিধ্বনি,
খুশীর দূত হাতে জড়ানো স্বপ্ন
ভাবনার গ্লাসে, চুমুক দেওয়া মন
মুহূর্ত অপেক্ষা
অথবা
চেয়ে থাকা
এখনও বেশ কিছুটা সময়
তারই দীর্ঘপথ হাঁটা।
আর
চলে যাওয়া পথে,
ব্যর্থ মন, শূন্য হাত সেই চির শান্তির দূত।

সুমিত ভাদুড়ী

নষ্ট হতে হতে এইবার

নষ্ট।
এভাবেই কাটে না দীর্ঘকাল। কাটে না।
খুব ধীরে শম্বুক গতির জীবন
আর নয়।
পাপবোধে নষ্ট ফুল-ফল, সামগ্রিক একপেশে
নিঠুর যন্ত্রণা
নিতান্ত কূট মন্ত্রণার পর
মুখোশের গড়াগড়ি
রক্তারক্তি ;
খর্বাকৃতি শীতলতা থেকে হার্দ্য উষ্ণতা তক্
আমার দরকার পাকাপোক্ত বিস্ফোরক নিটোল উল্লাস।

হাঁসফাঁস আর নয়। হয় না।
এইবার সূর্যের তাপ নিয়ে আমি
ছিটকে পড়বো লাভার মতো তোমাদের ঘাড়ে
নষ্ট হতে হতে এভাবেই ক্রোধে স্পষ্ট উঠে দাঁড়ানো।
এইবার।

প্রভাত মিশ্র

গাছগুলি

আজ যদি শেষ দেখি এই পৃথিবীকে,
এই উঁচু-নীচু গাছগুলি শেষবার আমাকে দেখছে
ভাবি, কী রকম লাগে ঃ
চুল্লীতে নিভছে ইন্ধন, পাশে বসে ফুঁ দিতে দিতে
চোখে মুখে মেখে নিচ্ছি ছাইচূর্ণগুলি—
জানলা খোলা আছে

কাছে কেউ নেই ঃ ভেবে নিই নিজের জীবনী,
মৃত অতীত যেন, শুয়ে আছে আগামী সকাল ;
হাতের তালুতে এত ক্ষয়, এত দীর্ঘ নীরব গভীর—
আমাকে ফেরানো যাবে ? আমাকে নোয়ানো যাবে আবার এবার ?

স্বপ্নে জাগরণ, অবিকল হাঁ নিয়ে ওপারে আকাশ :
আকাশের দিকে দৃষ্টি নেই কতোদিন—
সেদিন আকাশ ভেঙে পড়লো আমার মাথায় ।

ভয় পাই । ভয়ের ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে ঢেকে
ভয়ের বিষয় খুঁজি চারপাশ—
চেঁচিয়ে উঠতে যাই,—

খোলা জানালা

আবার ও গাছগুলি আমাকে দেখছে ।

•

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁড়ের টিয়া দাওয়ার আমি

টিয়া বসে দাঁড়ে আর
কুরে কুরে খেয়ে নেয়
ভালোবাসার পেয়ারা ।
কে যে এসে দিয়ে গেল
আমি ? হয়তো বা তাই
খুশি, কখনও বা আত্মহারা ।
লাল ঠোঁট মসৃণ
স্তূপ থেকে নেমে এসে
জমা করে সুবাসের ।
টিয়া, তুমি কি আমার ?
কিংবা দাঁড়ের ? অথবা—
শিকল আর দাঁড়ের ?
প্রশ্নের উত্তরে টিয়া শুধু
ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে ।

বিদেশী ভাষা থেকে ঃ

আমেরিকা

অ্যাড্রিয়ান হেনরী

[অ্যাড্রিয়ান্ হেনরীর জন্ম ১৯৩২ সালে । কবিতা এবং চিত্রশিল্প—দুটিতেই সমান আগ্রহ । লিভারপুলের ইংরেজ কবিগোষ্ঠীর অন্যতম রায়ান্ প্যাটেন এবং রবার্ট ম্যাক্গফ-এর সহযাত্রী । বেশ কিছু কবিতার বই আছে, আছে রেকর্ড । আর্ট কলেজের সঙ্গে যুক্ত ।]

টি, এস, এলিয়টের স্মরণে

আমি গত রাতে বেরিয়েছিলাম এবং খবরের কাগজ দেখিনি অথবা দেখিনি টেলি
এবং পরের দিন এক কাফেতে আমায় কে যেন বলল তুমি মারা গেছো
এবং মনে হলো দূর সম্পর্কের এক কাকা মারা গেছে
অদ্ভুত বড় ঘরে বুড়ো হাত নতুন ঝকঝকে উপহার
বড়দিনে
এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না কি অনুভব করবো ।

বছরের পর বছর আমি জীবনকে মেপেছি তোমার কফির চামচে

তোমার কবিতাগুলো বিছানার পাশে ধুলোপড়া বসার জায়গার টেবিলে
তোমার কবিতা পাঠের একখানা এল, পি, বাজছে বিপর্যয় জানুয়ারীর
ভেজা বিকেলে

এর মধ্যে ওয়েষ্টল্যাণ্ডে ফিরে ঃ

মরেন্ ও' হারা ছোটোখাটো পোশাকে ছুটছে রিহ্বিল স্যাণ্ডহিল ধরে
লিভারপুলের পাব-এ প্রেমিক-প্রেমিকা যাচ্ছে গুচ্ছে ফুলে
পড়ছে আলফ্রেড দ্য ভিগ্নি ল্যাভারীতে
খুলছে একখানা বিশাল পিয়ানো এবং পাচ্ছে সেখানে তরকারীর গন্ধ

ভারতের তারকাকে পাওয়া গেল এক বাস ষ্টেশনে

প্রেম করছে এক অন্ধকার ঘরে সিঁড়ির চাতালে এক বৃদ্ধার
মূর্ছা যাওয়ার শব্দ শুনে
শীতের প্রথম তুষারের স্তর জমছে মেয়েটির ক্রিসমাসের
কবিতার ওপর যেটি তিনি লিখেছিলেন পিকাডেলী বাগানে
আমার জন্যে
শহরের কাউণ্টারগুলোয়
বসন্তের প্রথম চিহ্ন প্লাসটিক ডাফোডিলগুলোয়

প্রেমিক-প্রেমিকারা চুম্বন করছে

বৃষ্টি পড়ছে
কুকুরগুলো ছুটছে
এবং তুমি 'সুপরিচিত যৌগিক আত্মা' নেমে আসছো
ধীরেসুস্থে ক্যানিং স্ট্রীটে বৃষ্টি আর কুয়াশার রাতে।

অনুবাদ ঃ অর্ণব সেন

কবিতার খবর

আমাদের অন্যমন দাশগুপ্ত শিলিগুড়িতে কবিসভা করতে গিয়ে ধূপগুড়িতে আর কোনদিন ফিরবে না। কবিতার জন্য পৃথিবী ছেড়ে চিরদিনের জন্য অন্য কোনখানে চলে গেছে।

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

সংস্কৃত

কবি অমরু

[খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন এক সময়ে অমরু কবি রচনা করেছিলেন শৃঙ্গাররসের একশো শ্লোক। যা সংস্কৃত কাব্যে অমর শতক নামে পরিচিত।]

অমরু শতক

রতিক্রীড়া হলো, বিপরীত রতি, শেষে তন্বীর অলস ধীর
দুই চোখ, আর এলায়িত চুল, দোলে কুণ্ডল, ঘামের ফোঁটায়
কপালের টিপ ধুয়েমুছে গেছে, তোমাকে রাখুক ওই তন্বীই
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এইসব দেবতা লাগবে কোন প্রয়োজনে ?

অধর পল্লব দংশনে ভীত নায়িকা বলছে আঙুল নাড়িয়ে
'না, না, ছাড়ো তুমি, ধূর্ত প্রেমিক', বলে সে কাঁপায় ভ্রূলতা তার,
আর চোখ বোঁজে শীৎকার করে, তাকে যে দেয় সবলে চুম্বন
অমৃত সে পায়, মূর্খ দেবতা বৃথাই সমুদ্র করে মন্থন ॥

ওগো সুন্দরী ! যাকে দেখ তুমি অলসমন্থর প্রেমভরা চোখে
সে চোখ নরম, অভিমুখী ফের, বলো সে কোন সফল পুরুষ
অনিমেষে যাকে চঞ্চল হয়ে লাজুক দুচোখে যেভাবে দেখছো
তাতেই ঠাহর বেশ করা যায় তোমার মনের কি যে অভিলাষ ॥

ওই আঙুলের নখ দিয়ে কেন নীরবে মুছছো চোখের জল
তোমাকে শব্দ তুলে আরো জোরে কাঁদতেই হবে, হে ক্রুদ্ধা নগরী,
কেননা কু-এর কথা শুনে তুমি বড়ো বেশি মান দেখিয়ে ফেলেছো,
এখন তোমার প্রেমিক ক্রুদ্ধ, তোমার তো আর মান ভাঙাবে না ॥

দিয়েছো প্রণয় ওই নায়িকাকে, লালন করেছো বহুকাল ধরে,
তাকেই তো ফের রুষ্ট করলে, করোনি তো তুমি প্রিয় ব্যবহার,
এই দুঃখ কি সওয়া সহজ, সান্ত্বনা দিয়ে ভোলানো যাবে না,
তোমার এ-প্রিয়া না হয় কাঁদুক অভিলাষ মতো, ওগো নিষ্ঠুর ।।

অনুবাদ ঃ তপন বন্দোপাধ্যায়

কানপুর

[কলকাতার পার্কে, ময়দানে, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে নিয়মিত কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা দেখা যায়। এ নিয়ম রক্ষা করে আসছেন কয়েক দশক ধরে। সেক্ষেত্রে কানপুর শহরের কবিরা হয়ত অর্ধ-দশকও সমাপ্ত করতে পারেন নি সাহিত্যের বাজারে। কিন্তু সাহিত্য-চর্চার ঢেউ ক্রমশ বেড়েই চলেছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। এই স্বল্প অবয়বে তাঁদের সার্বিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে পরিচয়ের আওতায় এসেছেন—তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।]

ব বসু—জন্ম, লেখাপড়া এবং কবিতায় হাতে খড়ি এই কানপুর শহরে বসেই। বর্ণর যা বয়স তা থেকে বেশি মনে হয়। মাঝারি গড়ন, রোজ সকালে এক-দু মাইল হাঁটা চাই-ই। বর্ণ অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট কবিতা লিখে যাচ্ছেন গত ৭।৮ বছর ধরে। লাজুক বর্ণ সহজ, সরল জীবন যাপনে থাকতে ভালবাসেন। ভালবাসেন হোমিওপ্যাথি বই পড়তে। বর্তমানে 'খেয়াল' পত্রিকার একনিষ্ঠ কর্মী।

বরেন সরকার—দীর্ঘ এক দশক হলো কানপুরে আছেন। দিলখুশ মেজাজের লোক। পেছনে অনেক দুঃখ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও রাত জেগে পায়ে হেঁটে সাহিত্যের জন্যে কষ্ট স্বীকারে সর্বদা উন্মুখ। ১৪।১৫ বছর আগে কলকাতা থেকে 'উৎকণ্ঠী' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদনার কাছে নিযুক্ত ছিলেন প্রায় দু-বছর। এখন খেয়াল পত্রিকার প্রধানতম উপদেষ্টা। নানা পত্র-পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত গল্প পড়লে মনেই হয় না বরেনের বয়স ৪৪।৪৫। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে একাউন্টস বিভাগে রয়েছেন। এমন কোন রোববার নেই যে গল্পকার বরেনের বাড়িতে সাহিত্যের মজলিশ বসে না।

ভূপালচন্দ্র সেন—বয়স পঞ্চাশ কিংবা দু-এক বছর বেশি হতে পারে। নিয়মিত গদ্যচর্চা করে যাচ্ছেন। আর তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত শুনলে বয়স অনুযায়ী মোটেও ভাঁটা পড়েন নি একথা সবাইকে মনে করিয়ে দেয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

শিখা পাল—দীর্ঘ তের বছর কানপুরে আছেন। সংসারের কাজের ফাঁক-ফোকরে কলম নিয়ে বসেন। তাই বুঝি দেখতে পাওয়া যায় তার রচনায় শিল্পী ও সুন্দরী সংসারী মনের ভাব। নাটক করতে ভালবাসেন।

নিবেদিতা দত্ত—প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লেখেন সময় এবং মুড এলেই।

শিবাজী সান্যাল—স্মার্ট, অল্প বয়স্ক এই যুবক এক প্রাইভেট ফার্মের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। কলকাতা ছেড়ে এসেছেন বছর তিনেক। হলো শোনা যাচ্ছে এই লেখকের একটি উপন্যাস শীঘ্র প্রকাশ পাবে।

সুকুমার সাহা—বয়স ৩০।৩২। যে-কোন সাহিত্যের আড্ডায় সুকুমারকে দেখা যায়। কবিতা নিয়ে আলোচনায় বসলেই বিদেশী সাহিত্যকে টেনে নিয়ে আসেন। কবিতায় সিদ্ধহস্ত, কিন্তু একটু অভিমানী—তাই ভয় হয় ভবিষ্যতে অন্য পথে চলে না যান!

শুভ্রা দত্ত—শুভ্রা হিন্দী সাহিত্য নিয়ে এম, এ, পড়ছেন কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেশ কয়েকটি হিন্দী গল্পের বাংলা রূপান্তর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আড্ডায় তাকে নিয়মিত দেখা যায়।

অসীম কুণ্ডু—বাংলার শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে ভালবাসেন। লেখেন প্রচুর কিন্তু ছাপাতে চান না।

মলয় গোস্বামী—২০।২২ বছরের এই যুবকের হাতে কবিতা রয়েছে—চর্চার দ্বারা তা সফল হতে পারে।

উমা মজুমদার—সংসার সামলিয়ে সাহিত্যের জন্যে কিছুটা সময় ত্যাগ করতে রাজী। লেখালেখির ব্যাপারে সংকোচ করলেও শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু একটা লিখে দেন।

স্বপন মুখোপাধ্যায়—কানপুরে এসেছেন মাত্র এক বছর হলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আবৃত্তি, নাটক করে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন। লেখেন কম, কিন্তু সমালোচনা করতে ভালবাসেন—তাই স্বপনের লেখা খুব কম ছাপার অক্ষরে দেখা যায়।

কল্যাণী সরকার—তিন বছর যাবৎ ত্রৈমাসিক 'খেয়াল' পত্রিকা সম্পাদনা করে আসছেন। মাঝবয়সী এই ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে সব সময় হাসির জোয়ার লেগেই আছে। সংসার করেও যে নিয়মিত সাহিত্যের আড্ডায় দেখা যায়—এটা কম বড় কথা নয়।

———

কিঞ্চিত নিম্নকণ্ঠ, কিন্তু সে সুর সহজ সুরেলা, আপাত আভরণহীন মনে হতে পারে, কিন্তু আবরণহীন মোটেও নয় তার কাব্যপ্রতিমা। তিনি স্বপ্নের ভেতরে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাণ, কিন্তু বাস্তবের বিস্মরণে নয়, বরঞ্চ অনেক বেশী লগ্ন থেকে, মুখোমুখি হয়ে না হলে কখনোই 'ধূসর বালুর চরে যন্ত্রণার ছায়াঘর বাঁধি/আর সেই ঘরের ভিতর/বারবার জন্ম নিয়ে আসি/বারবার জীবনের সফলতা খুঁজি (পাতা ঝরার শব্দে, পৃষ্ঠা ৪২)'র মতন এত গাঢ় উচ্চারণ কখনোই সম্ভব ছিল না। লক্ষ্যনীয় এই যে তিনি সফলতার অন্বেষাই কোরেছেন; পেয়ে গেছি এমন কিন্তু বলেননি। তিনি জানেন বাস্তব অনেক বেশী রূঢ়, তাই তার কলমও 'তবু আমায় ফিরতে হবে' কবিতায় আরো বেশী গূঢ় হয়ে উঠেছে এবং যা তিনি তার সমগ্র কাব্যগ্রন্থে বলতে চাইছেন তাও বলে নিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে উৎকণ্ঠাহীন: মলিনতার ছোঁয়ায় হায় প্রেম হয়েছে ফিকে/ভালোবাসার হাতটা তবু বাড়াই সবার দিকে। এ যেন সেই শাশ্বত কোনো এক প্রেমিকের চিরকালীন কণ্ঠস্বর 'লেগেছে কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না'—এরকম। যদিও কবি ওয়াজেদ আলী সতত সন্ত্রস্থ, ভীত এবং বিব্রত, প্রেমহীনতা তার কাছে রীতিমতন একটা ব্যাপার, তিনি অবশ্যি স্বীকারও কোরেছেন অকপটে 'তুমি ঘৃণা করো বলে/আমার স্বপ্নের দিনগুলো নিঃস্ব হয়ে যায়/ [তুমি ঘৃণা করো বলে পৃষ্ঠা ১৮] অথবা তুমি চলে গেলে আমার উঠোন জুড়ে/অন্ধকার নামে [ছিন্ন এক স্মৃতি নিয়ে পৃষ্ঠা ৩৮] তবু সে অর্থাৎ কোনো এক 'তুমি' তবু চলে যায় তাই তার বিষণ্ণতাই হয়ে দাঁড়ায় অমোঘ, বারংবার চরাচরে একটি ধ্বনিই প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরেফেরে বুক ভাঙা হাহাকারের মতো 'অনন্ত একবার/আমাকে তোমার কাছে করে নাও/ [অন্তত একবার, পৃষ্ঠা ১৯] কিন্তু না, সে ফেরে না, তিনি ঘুরে বেড়ান 'একা একা অনাত্মীয়ের মত' কিন্তু সান্ত্বনার চন্দন প্রলেপ চাই, তাই তিনি শেষঅব্দি স্বদেশের নিসর্গের কাছেই নিবেদিত হন, তিনি বলে ওঠেন 'শুধু

আমার দু চোখের নীরব দর্পণে/ফুটে ওঠে প্রকৃতির শান্ত ছায়া/ [বস্তুত আমার চারপাশে, পৃ ১০] শুধু কি তাই? ভেতরের ভার তার অনেকখানি হালকা হয়ে যায় 'আর সেই ছায়ায় ছায়ায়/আমার মানসিক দুঃখগুলো শিশির হয়ে ঝরে'—এই অনুভূতি তখন আর বোধহয় কবির একার থাকে না, হয়ে ওঠে আমাদের অনেকের কণ্ঠস্বরেই একান্ত কোরাস।

নিসর্গ শুধু তার মনের ভারগুলোকেই হালকা করেনি তাকে দিয়েছে জীবনকে বোঝার অনুপম অনুভূতি, তার ভেতরে 'কবিতার চন্দ্রালোকে শিল্পঋদ্ধ হয়' [আরণ্যক, পৃষ্ঠা ৩১] তিনি 'নিশুতি গাছের ভাষা'ও বুঝে উঠতে পারেন। আসলে তিনি বেজে উঠতে পারেন—সংগীত সৌরভ শোভা, জগতে যা কিছু আছে কবি হেথা প্রতিষ্ঠনিয়ম'।

অবশ্যি 'মানুষের কান্না থেকে দূরে' তিনি মাঝে মধ্যে যেতে চাইলেও তার এই যাওয়া কিন্তু পলায়নি মননের নয়, তবুও দ্বান্দ্বিক চেতনা মাঝে মাঝে কি স্বাভাবিক নয়? কবিও তো মানুষ! কিন্তু যেতে যেতেই তো তিনি আবার থমকে যান 'প্রতিবেশী শীর্ণমুখ ভিখিরি বালক/ছায়ার ভিতরে শুধু ছায়া রেখে যায়…[ছায়ার ভিতরে ছায়া, পৃষ্ঠা ৪৭] শুধু সেন্টিমেন্ট তৈরী করতে তিনি আসলে চাননি যা কিছু তার দৃষ্টি চুম্বনে সত্যের আস্বাদ এনে দিয়েছে তাই-ই তিনি প্রকাশ করেছেন। অবশ্যই এটা যে-কোনো সৎ কবি কর্মির জন্য শ্লাঘার ব্যাপার। আধুনিকতার নাম করে তিনি কখনোই দুর্বোধ্য হতে চাননি, লিরিক্যাল এবং রোমান্টিক তিনি; যদিও কবি ওয়াজেদ আলী হচ্ছেন 'যে মানুষ স্বেদে রক্তে মুছে নেয় অনন্ত বিষাদ' [সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয়, পৃষ্ঠা ৪০] তাই তার ভবিষ্যৎ তার কাছে 'অলৌকিক সংকেত' পাঠায়, অবশ্যই তা ধন্যাত্মক। তার কাব্যযাত্রা যেহেতু 'অন্তত একবার' তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—মহান শিল্পের স্টেশনে ছুটে চলা বিষণ্ণ রাত্রীর ট্রেন…অবশ্যই 'এখন আমার তনু-মনে তুমি একটা সকাল এঁকে দাও'—সেই সকালের দিকে এগিয়ে চলেছে…এই তার স্নিগ্ধ পূর্বাভাস।

—জগন্ময় মজুমদার

'অন্তত একবার' / ওয়াজেদ আলি। কমলা বুক ডিপো | ৩০ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ | চার টাকা।

২

৩১টি বাংলা ও ৮টি ইংরাজী কবিতার সংকলন "তারা গাঁথা সিঁথি"। কমল তরফদারের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ের ফসল এই কাব্যগ্রন্থ। অথচ এতে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮। জানি না, এটাও কবির মমতা ও খেয়ালবশত কি না। পাশাপাশি স্থান পেয়েছে 'কাকতাড়ুয়ার দুচোখ দিয়ে নামে জল। শিশিরে চোখের জলে খড় ভিজে যায়।' (ছায়ার জন্য) কিংবা 'পরিচয় শুধুমাত্র স্ত্রী পুরুষ। দুই ভয়ংকর দানব / নিষ্ঠুর এবং অকৃত্রিম /' (দুই ভয়ংকর দানব) অথবা 'তারপর সমস্ত জীবন/একটা একটা করে বিশ্বাস ভাঙ্গি/সমস্ত জীবন/' (কুয়াশা) এবং 'চিত হয়ে শুয়ে পড়ল শ্রমিক/পাঁচশো একাত্তর / স্থির হয়ে গেল সময়/এবং দীর্ঘকা মানুষ' (দুঃশমন) এইসব সুন্দর কাব্যিক অনুভূতির চিত্রময় প্রকাশ যে-কবির কবিতায় সে কেন এখনও সোচ্চার নির্লজ্জ ঘোষণা-মূলক লাইনকে স্থান দেবে—সেটা আমার বোধগম্য হল না। কয়েকটি উদাহরণ ঃ 'বাড়িতে এ্যালসেশিয়ান থাকলে/আদর করতে করতে দিত সর্বাঙ্গ চেটে/দুষ্মন্ত চুমু খেলে আর আপত্তি কি/' (শকুন্তলা) কিম্বা 'এবং ছেলের লিঙ্গ ধরে/কাঁরিয়ে দেয় হস্তমৈথুন/' (চাঁদির পাহাড়) এছাড়া, 'বেত', বা 'পয়সা দেবতা' কবিতার চমক লাগানো ছাড়া অন্য কি সাহিত্য মূল্য থাকবে। এগুলিকে সাম্প্রতিক বলা চলে এই মাত্র। এতকথা বলবার মূল উদ্দেশ্য এই যে কমল তরফদার অনেকদিনের একটি পরিচিত নাম। লেখা ভাল লাগে। যার লেখা ভাল লাগে চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তার আরও নির্বাচন-মূলক হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি।

কমল তরফদারের সঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে, 'ঘাসেও মাথা রাখতে পারি / কিংবা কোনো হলুদ মেয়ের কোলে/বোধিবৃক্ষের পাতা হাওয়ায় দোলে' / কিন্তু হোঁচট খেতে হয় আর এক লাইন এগুলেই 'আর একটা অনির্বাণ শিখা/গম্ভীরভাবে কাঁপে চেতনায়' (সাঁচিস্তূপে চেতনা)। 'গম্ভীরভাবে' কথাটা কি কানে বাজে না। ছন্দকে করায়ত্ত করেও এইসব ছোটখাট ত্রুটি

কেন থেকে যাবে 'কৌরবে'র প্রতিনিধি স্থানীয় কবি কমল তরফদারের বই-য়ে।

—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

'তারা গাঁথা সিঁথি / কমল তরফদার / অয়ন, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ / দাম—চার টাকা।

৩

আজকাল কবি আর কবিতাকে দশক দিয়ে বিচার করার এক তথাকথিত পণ্ডিতি প্রচেষ্টা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু কবি আর কবিতাকে সত্য সত্যই কি দশক দিয়ে বিচার করা সম্ভব? এবং দশক দিয়ে কি আদৌ বিচার করা সঙ্গত? হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে তা সম্ভব। হয়তো বা কোথাও কোথাও তা সঙ্গতও। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'তুমি এলে' (১৯৬৯) এবং 'নৈঃশব্দের অনুভব' (১৯৭৪)-এর পর সম্প্রতি প্রকাশিত কবি নির্মল বসাকের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সময়ের খেলনা' (ডিসেম্বর ১৯৭৮) যেন কবি ও কবিতার এই তথাকথিত দশক বিচারের পণ্ডিতি প্রচেষ্টারই তীব্র—সোচ্চার প্রতিবাদ। এই কাব্য গ্রন্থখানি যেন স্বতঃই প্রমাণ করে—সমুচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করে কবি ও কবিতার বিচারের ক্ষেত্রে এইরূপ পণ্ডিতি প্রচেষ্টার অসারতা তথা অপ্রয়োজনীয়তারই কথা। যদিও তাঁর কাব্যগ্রন্থখানির নাম 'সময়ের খেলনা' তবু কবি তাঁর কবিতাসমূহের কোথাও বিশেষ কোন সময় বা দশককে তুলে ধরার কোনরূপ—কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি বরং সর্বত্রই তিনি সময় বা দশক থেকে আপনাকে উত্তীর্ণ করতে—আপনার কবিতার উত্তরণ ঘটাতে সযত্নেই সচেষ্ট হয়েছেন। এবং একথা বলাই বাহুল্য কবি তাঁর সযত্ন সে প্রচেষ্টায় যথার্থ অর্থেই সর্বাংশে সার্থক এবং সফল হয়েছেন।

তবে কি কবি নির্মল বসাকের এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সময়ের খেলনার' নামকরণ নিতান্তই পরিহাস বিজল্পিতম্? কবি কি তাঁর এই কাব্যে সময়ের কথা একেবারেই বলেন নি? না—'সময়ের খেলনা' কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ নিতান্তই পরিহাস বিজল্পিতম্ নয়। হ্যাঁ এতে তিনি সময়ের

কথা বলেছেন এবং অত্যন্ত বেশি করে—অতীব তীব্রভাবে সমুচ্চকণ্ঠে, সোচ্চারেই বলেছেন। তবে সে সময় কোন বিশেষ সময় নয়। সে সময় হল একান্তই নির্বিশেষ সময়—সে সময় হল শাশ্বতকাল বা চিরন্তন সময়। সে সময় হল সেই সময় যে সময় একই সঙ্গে এক সূত্রেই অনাদি অতীত, সমুন্নত বর্তমান আর অন্তহীন ভবিষ্যতকে অনায়াসে, অবহেলে অবলীলা-ভরেই অনুস্যূত করে রাখে। আর এইখানেই 'সময়ের খেলনার' কবি নির্মল বসাকের কাব্যসাধনার সামগ্রিক সিদ্ধি। আর তাই তো তিনি প্রকৃত অর্থেই স্রষ্টা—সত্যিকারের বিচারে অভিনব অত্যাশ্চর্য দ্বিতীয় বিধাতা।

—পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত

সময়ের খেলনা—কৃষ্ণকলি; প্রযত্নে ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০১২। দাম ছয় টাকা।

With best Compliments from :

N. I. ASSOCIATES